স্বামীজী ও তাঁর মানসকন্যা

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭১

SWAMIJI O TAR MANASKANYA
A book on Swami Vivekananda & Sister Nivedita, by Swami Devendrananda. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10, Shyama Charan De Street. Calcutta-73.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নবমুদ্রণ ১বি, রাজা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে কমল মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

মনুষ্যসমাজে স্বামী বিবেকানন্দ এক মহাবিস্ময়—যেন বিস্ময়ের সমুদ্র আর তাঁর মানসকন্যা 'নিবেদিতা' সেই মহাবিস্ময় বা মহাসমুদ্রেরই এক তরঙ্গ বিশেষ। আমি সেই মহাসমুদ্রেরই মাত্র এক কণা স্পর্শ করতে চেষ্টা করেছি 'স্বামীজী ও তাঁর মানসকন্যা' গ্রন্থে। সেই সঙ্গে আমার এ-ও মনে হয়েছে, কোন মানুষের পক্ষেই বিবেকানন্দের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এবং তা সম্ভব হবে কেবলমাত্র আর একজন বিবেকানন্দের পক্ষেই। ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হলেও এমনি ছিল জীবনসায়াহ্নে বিবেকানন্দেরই স্বগতোক্তি! (তবে তা আত্মগরিমায় নয়, স্বীয় আত্মশক্তি ও বিশালত্বে বুঝি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য!) তাই বলি, সেই মহাসমুদ্র বা বিবেকানন্দ-সমুদ্রের সংস্পর্শে যে যতটুকু স্নিগ্ধ হতে পারে—পবিত্র হতে পারে তার ততটুকুই লাভ।

আবার নিবেদিতা সম্বন্ধেও স্বামীজীর উক্তিই হল শেষ কথা—"বিলেতের ভিতর এমন পূতচরিতা মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।" ভারতবর্ষ নিয়ে স্বামীজীর ধ্যান-ধারণা তাঁর মানসকন্যাতেই মূর্তরূপ পরিগ্রহ করতে সচেষ্ট ছিল বিশেষভাবে। তাই নিবেদিতা সম্বন্ধে একথাও বলা যায় মাত্র ৪৪ বছরের জীবনে 'ভগিনী' থেকে 'লোকমাতা' এবং পরিশেষে 'ভারতমাতা' রূপেই তাঁর সার্থক উত্তরণ হয়েছে। নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে প্রখ্যাত বাগ্মী ও নেতা ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ যা বলেছিলেন তাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—"If we are conscious of a budding national life at the present day, it is to a great extent due to the teaching of Sister Nivedita".

'স্বামীজী ও তাঁর মানসকন্যা' গ্রন্থটির প্রায় সবগুলি প্রবন্ধই 'উদ্বোধন', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'বর্তমান' ও 'কথাসাহিত্য' পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশক-সংস্থার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

বিষয়-সূচী

স্বামীজী
ও তাঁর
মানসকন্যা

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা ও
শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্বামী বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা

রূপকথার সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

সময়টা ছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় তখন ভবঘুরে। চাল-চুলো ঠিক-ঠিকানা নেই। কালা আদমি। পকেটে পয়সা নেই, শীতবস্ত্র তো নেই-ই, প্রাচ্যদেশ থেকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন বিশ্বধর্ম মহাসভায়, সে পরিচয়-পত্রটিও খোয়া গেছে পথে কোন সময়ে। ফল যা হবার তাই হলো। কালা আদমিকে সবাই তাড়া করলো। একদিকে অনাহারক্লিষ্ট মুখ, আবার কিম্ভূতকিমাকার প্রাচ্যদেশীয় সন্ন্যাসীর পোশাক, ধনতান্ত্রিক সেই দেশে দুটোই বেমানান। তবে প্রাচ্যের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে উপভোগ্য বটে। রাস্তায় তাঁকে নিয়ে লোকে নানা মজা ক'রে, হাততালি দেয়। দুষ্ট ছেলেরা পিছনে লাগে, আবার সঙ্গে যে সামান্য পয়সাকড়ি আছে, সুযোগ বুঝে তাও ঠকিয়ে নেয় প্রতারকরা।

ঈশ্বরের অচিন্তনীয় লীলাই বটে। ক'দিন পরে যে বিবেকানন্দ-উল্কাপাত হবে বিশ্বধর্ম মহাসভায়, যে বিবেকানন্দকে কাছে পাওয়ার জন্য কোটিপতি ধনীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবেন, যাঁর কথা শুনে পাশ্চাত্যের সেরা লোকেরা অর্থাৎ পণ্ডিত-মনীষীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাববেন—"বিবেকানন্দ বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় প্রবীণ।" অথবা তাঁর কাছে "পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ-বিকিরণে কী অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা।"—সেই বিবেকানন্দ দৈব-দুর্বিপাকে আজ আমেরিকার পথের ভিখারি, রাস্তার মানুষের উপহাসের পাত্র!

বাস্তব-জগৎ বড়ই কঠিন। তাই বুঝি দশচক্রে ভগবানও ভূত হন। সেইরকম অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন এক চিঠিতে—"আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার (মিস কেট স্যানবর্ন) অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইহার সহিত রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতেই হইবে। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে।"

কিন্তু বিবেকানন্দ—বিবেকানন্দই। বাস্তব-জগতের উপেক্ষা ও ভ্রুকুটীতে দমবার পাত্র বিবেকানন্দ নন। যে বিবেকানন্দ কপর্দকশূন্য হয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করেছেন এবং বহুবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও

স্বীয় আত্মবলে আবার জীবনশক্তি ফিরে পেয়েছেন এবং সেকথা পরবর্তী সময়ে বলেছেনও তাঁর এক বিখ্যাত বক্তৃতায় (বক্তৃতার শিরোনাম—'সুবিদিত রহস্য')—

"বারবার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছি, মনে হইয়াছে এইখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি লুপ্তপ্রায়। কিন্তু অবশেষে এই মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে : আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই, আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন্, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার করো। তোমার হৃত রাজ্য পুনরধিকার করো। ওঠো, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ এখানে [পাশ্চাত্ত্যে] সশরীরে বর্তমান আছি"—সেই ব্রহ্মবিৎ মহাতেজস্বী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ায় এসেছিলেন তাঁর বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই। কাজেই কোন বিরুদ্ধশক্তিরই তখন সাধ্য ছিল না তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করার। সেই অসহনীয় অবস্থা ও তাঁর অটুট মনোবলের কথা ফুটে উঠেছে তাঁর সেই সময়কার চিঠিতেও—"শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ হইতে চলিয়া যাই ; কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমি কোন পথ দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।"

যে দুঃখের কষ্টিপাথরে বিবেকানন্দ খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছিলেন, পাশ্চাত্ত্যে এসে সেই দুঃখের নিষ্পেষণে তখন ধর্মপ্রচারের চেয়েও তাঁর মনে বেশি জেগেছিল তাঁর দীনদুঃখী ভারতবাসী ও তাদের অভাবমোচনের কথাই। সেই মর্মান্তিক যাতনার মধ্যেও তিনি তাঁর অনুগামী যুবকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্যকর্মের কথা, আবেগময়ী ভাষায় চিঠি লিখে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, দেশসেবার কাজে। ধর্মসভায় বিবেকানন্দের সাফল্য-অসাফল্যে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু তাঁর চোখের জল—তাঁর 'মিশন' তাঁর মরণপণব্রত যেন ব্যর্থ না হয়। ধর্মমহাসভায় যোগদানের প্রাক্-মুহূর্তেও বিবেকানন্দ-আত্মার মর্মান্তিক কান্না শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর মাদ্রাজবাসী অনুগামী যুবকেরা, তাঁদের লিখেছিলেন—"নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, 'ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়'। কোমর বাঁধো, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন।—আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি। তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর আমার স্বদেশের লোকেরাই যখন আমাকে জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশি

ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কী-ই না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা—দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান করো; বলি—জীবন-বলি তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালোবাসেন। সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ করো, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

সত্য ঘটনা, বাস্তব ঘটনা বুঝি কখনো কখনো রূপকথা বা উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়। বিবেকানন্দ-জীবনও মুহুর্মুহু সেই সত্যের আলোকেই আলোকিত—যা সাধারণ মানব-মনের ধারণার বাইরে। অসহায় অপরিচিত বিবেকানন্দ বস্টন শহরে থাকাকালীনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক মিঃ রাইট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। অজ্ঞাতকুলশীল ভবঘুরে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁদের মত কিভাবে বদলে গেল শ্রীমতী রাইট তাঁর মাকে একটা চিঠিতে খুব সুন্দরভাবে তা লিখেছেন। শ্রীমতী রাইট লিখছেন: "অদ্ভুতভাবে আমাদের সময় কাটছে। কেট সানবর্ন যে একজন হিন্দুকে পাকড়েছে, তা আমি বোধহয় আমার শেষ চিঠিতে লিখেছি। জন (অধ্যাপক রাইট) তাঁর সঙ্গে বস্টনে দেখা করতে গিয়ে, দেখা না পেয়ে, তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল। ঘন পীতবর্ণ দীর্ঘ পোশাক পরা মানুষটি শুক্রবারে এলেন—সকলে চমকিত। অদ্ভুত জমকালো দৃশ্য—তিনি! মাথা খাড়া রাখার অপূর্ব ভঙ্গি, প্রাচ্যরীতিতে অসাধারণ সুদর্শন, বয়সে ত্রিশ, সভ্যতায় সুপ্রাচীন। সোমবার পর্যন্ত তিনি ছিলেন। জীবনে যত লোক দেখেছি, তাঁদের মধ্যে অতুলনীয়ভাবে আকর্ষণীয়। দিনে রাতে সারাক্ষণ আমরা কথা বলেছি, পরদিন প্রভাতে আবার কথা শুরু করেছি নতুনতর আগ্রহ নিয়ে। তাঁকে দেখতে শহর পাগল। মিস্ লেন-এর বোর্ডাররা উত্তেজনায় উন্মত্ত। তারা অবিরত ঘর বাহির করছে। উত্তেজনায় ক্ষুদ্রকায় মিসেস্ মেরিলের জলজলে চোখ, টকটকে গাল। আমরা প্রধানত ধর্মবিষয়ে কথা বলেছি। এ যেন একটা নবজাগরণ। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন উদ্দীপিত আমি আর হইনি।...এই মানুষটি অসাধারণ বুদ্ধিমান। কিভাবে যুক্তিপ্রয়োগ করতে হয় জানেন, জানেন কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায় না। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয়।"

আগেই বলা হয়েছে, বিবেকানন্দ-জীবনের ঘটনাবলী রূপকথার চেয়েও বুঝি রোমাঞ্চকর, আমেরিকার রাস্তার ভিখারি বা ভবঘুরে বিবেকানন্দ যে শীঘ্রই লাভ করবেন অধ্যাত্ম জগতের রাজসিংহাসন—অধিষ্ঠিত হবেন মানুষের হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটিতে, তারই সূচনা দেখা গেল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার পর থেকে। বিবেকানন্দ-গুণমুগ্ধ অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বিবেকানন্দকে স্বচ্ছন্দে পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন, ভুল বললাম, নিবেদন করলেন তাঁর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্যটি। লিখেছেন—"ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব অধ্যাপককে এক করলেও এঁর সমকক্ষ হবেন না।"

আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় গিয়ে সম্মানের শ্রেষ্ঠ শিরোপাটি অধিকার করার আগে বিবেকানন্দ-জীবনের আর এক রূপকথার কাহিনী শোনা এখনও বাকি। বস্টন থেকে অধ্যাপক রাইটের দেওয়া পরিচয়-পত্র নিয়ে বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে এসে আবার অকূল-পাথারে পড়লেন। কনকনে শীতল রাত। হোটেলে যাওয়ার মতো অর্থও পকেটে নেই। আবার ঠিক কোন্ জায়গায় ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধেও তাঁর ঠিক ধারণা নেই। শিকাগো ধনী ও ব্যবসায়ীদের অট্টালিকায় পূর্ণ। তাই তিনি অন্তত সেই রাতটুকু শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পথের ধারে পরিত্যক্ত একটি খালি প্যাকিং বাক্সের মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিলেন এবং বাকি রাতটুকু সেখানেই কাটালেন। পরদিন সকালে আবার তিনি রাস্তায় চলতে শুরু করলেন। ধর্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজের ঠিকানাটিও তখন তাঁর কাছে নেই অথবা তিনি তা হারিয়ে ফেলেছেন। এরকম অবস্থায় ঘোরাঘুরিই সার। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে, বিশেষত এর আগে অনেক জায়গায় কালা আদমি বলে বিদ্রূপ উপেক্ষা ও তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছে, তাই তিনি অনন্যোপায় হয়ে ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে কাতর হয়ে এক পথের ধারেই বসে পড়লেন। এরপরেই অভূতপূর্ব কাণ্ড, পথের অপরদিকের এক অট্টালিকা থেকে রূপকথার রাজরানীর মতোই এক মাঝবয়সী মহিলা বেরিয়ে এসে ধূলিধূসরিত শ্রান্তক্লান্ত বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন—'মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?'

বিবেকানন্দের সব কথা শুনে, আর আমেরিকার মতো জায়গায় এরকম নিঃসম্বল এক সন্ন্যাসীর অসুবিধার কথা বুঝে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে একটি ঘরে তাঁর আহার ও বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং নিজেই তাকে সঙ্গে করে ধর্মমহাসভার অফিসে নিয়ে যাবেন কথা দিলেন। এইভাবে প্রায় দৈবকৃপায় সব মুসকিল আসান হয়ে যাওয়াতে স্বামীজীও খুবই আনন্দিত হলেন। এই বাড়িটিই শিকাগোর বিখ্যাত "হেল" পরিবারের। ওই ভদ্রমহিলাই মিসেস হেল এবং তাঁর স্বামী মিঃ জর্জ ডব্লিউ হেল। দুজনেই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। বাড়িতে থাকে তাঁদের দুই মেয়ে, মেরি ও হ্যারিয়েট আর দুই ভাইঝি

ইসাবেল ও হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলি। চারজনেই অবিবাহিতা। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজীর সঙ্গে এই পরিবারের এমন প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, স্বামীজী মিঃ ও মিসেস ‘হেলকে’ ‘ফাদার-পোপ’ ও ‘মাদার-চার্চ’ নামে ডাকতে থাকেন এবং হেল-পরিবারের কন্যা ও ভাইঝিরা স্বামীজীর কাছে হয়ে ওঠে বোনের মতো। কাজেই ধর্মমহাসভায় যোগদানের আগে স্বামীজীর দিনগুলি খুবই সুখের হয়ে ওঠে। এই সময় ‘হেল’ পরিবারকে নিয়ে স্বামীজী ভারতে তাঁর অনুগামীদের কাছে খুব সুন্দর চিঠিও লিখেছেন। লিখেছেন—“হেল আর তাঁর স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ি। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে।…চারজনেই যুবতী—বে-থা হয়নি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম—মনের মতো বর চাই। দ্বিতীয়—পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলায় পগারপার। ছুঁড়িরা নেচেকুঁদে একটা স্বামী জোগাড় করে। ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড় নারাজ। এইরকম করতে করতে একটা ‘লভ’ হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হলো সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়মানষের ঝি, ইউনিভার্সিটি ‘গার্ল’—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধহয় বে-থা করবে না—তার ওপর আমার সংশ্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।”

এরপর এলো সেই ঐতিহাসিক দিন। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বধর্ম মহাসভা। বিশ্বের তাবৎ ধর্মের প্রতিনিধিরা এসে উপস্থিত। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটালেন স্বামী বিবেকানন্দ। রাতারাতি তাঁর বিশ্বখ্যাতি হলো। এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কাণ্ডকারখানা। যে অভাবিত ব্যাপারের জন্য স্বয়ং বিবেকানন্দও প্রস্তুত ছিলেন না, সেই কথাই লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—“দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে [বক্তৃতা করতে] উঠলাম। [সভাপতি] ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গেরুয়া বসনে শ্রোতাদের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হয়েছিল। আমেরিকাবাসীদের ধন্যবাদ দিয়েও আরও দু'এক কথা বলে একটি বক্তৃতা করলাম। কিন্তু যখন আমি ‘আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভাই’ বলে শ্রোতাদের সম্বোধন করি, তখন দু'মিনিট ধরে এমন করতালিধ্বনি হতে লাগলো যে, কানে তালা লেগে যায়!…” এই ব্যাপারে বিস্মিত ও অভিভূত সভাপতি ডাঃ ব্যারোজও ধর্মমহাসভার ঐদিনের রিপোর্টে লিখলেন—“মিঃ বিবেকানন্দ যখন শ্রোতাদের ‘ভগিনী ও ভাই’ বলে সম্বোধন করেন, তখন এক তুমুল করতালিধ্বনি উঠে অনেক মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।” সেই ধর্মমহাসভায় উপস্থিত শ্রোতাদের একজন ছিলেন মিঃ এস কে ব্লজেট। তিনি বললেন—“আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই যুবকটি [স্বামী বিবেকানন্দ] উঠে যখন বললেন, ‘আমার

আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা,' তখন সমবেত সাত হাজার নরনারী এমন একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে উঠে দাঁড়াল যা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল না। যখন বক্তৃতা শেষ হল, তখন দেখি, দলে দলে মহিলা শ্রোতারা তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য বেঞ্চি ডিঙিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমি তখন মনে মনে বললাম, দেখো বাছা, এ আক্রমণে [অর্থাৎ সম্মান-প্রীতির জোয়ারে] যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারো তবেই বুঝব তুমি ভগবান।"

সে আনন্দ-উল্লাসের জোয়ারে পাশ্চাত্ত্যের নরনারী কিভাতে মেতে উঠেছিল তা আজ গল্পেরই মতো। বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দই ধর্মমহাসভায় সব ধর্ম ও সম্প্রদায়কে এক পতাকাতলে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই অভূতপূর্ব ব্যাপারে বিচলিত মহাসভার বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মিঃ স্নেল লিখেছিলেন—"মহাসভার উপর এবং আমেরিকার জনসাধারণের উপর হিন্দুধর্ম যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর কোনো ধর্মগোষ্ঠী সেরূপ করিতে পারে নাই।·· আর হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র; আবার তিনিই ছিলেন নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহাসভার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। মহাসভাকক্ষে এবং আমারই সভাপতিত্বে পরিচালিত উহার বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন এবং প্রতিবারেই খৃস্টান ও অখৃস্টান বক্তা অপেক্ষা সর্বাধিক উৎসাহ সহকারে গৃহীত হইতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন, জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিবার জন্যও উৎকর্ণ হইয়া থাকিত।···যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া খৃস্টান, তাঁহারাও বলেন, 'তিনি সত্যই নরসমাজে নরেন্দ্র।' সেইসঙ্গে তখনকার দিনের বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকার বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা তাঁকে ছেঁকে ধরতেন এবং দিনের পর দিন বিবেকানন্দের যে প্রশস্তি ও গুণগান প্রকাশিত হত যা আধুনিককালের অতি বড় কোন রাষ্ট্রনেতার পক্ষেও ঈর্ষণীয় বস্তু। পাশ্চাত্ত্য পত্র-পত্রিকার সেই বিবেকানন্দ-বন্দনার সামান্য কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

নিউইয়র্ক হেরাল্ড: "বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কথা শোনার পর আমরা অনুভব করছি—তাঁর জ্ঞানী দেশের মানুষের কাছে মিশনারি পাঠানো কী মূর্খতা।"

নিউইয়র্ক ক্রিটিক: "বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, মোহকর ব্যক্তিত্ব হিন্দু সভ্যতার সম্বন্ধে আমাদের নতুন চেতনা দিয়েছে। তাঁর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, গভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, অবিলম্বে অপরের হৃদয় অধিকার করে ফেলে—তিনি বিভিন্ন সংস্থা ও গির্জায় প্রচার করে নিজ ধর্মমতকে আমাদের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছেন। বক্তৃতার সময় কোন নোট রাখেন না; সর্বোত্তম শিল্পকৌশলের সঙ্গে নিজ বক্তব্যকে উপস্থিত করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান; তার মধ্যে থাকে অপরকে প্রভাবিত করার মতো সুগভীর আন্তরিকতা; এবং এই সকলের সমন্বয়ে তিনি প্রায়শ উন্নীত হন দিব্যপ্রেরণার শিখরে।"

বে সিটি ট্রিবিউন : "গতকাল বে সিটিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি বহুকথিত স্বামী বিবেকানন্দ, সেনেটার পামারের অতিথি।··· বিবেকানন্দের চমকপ্রদ চেহারা ; প্রায় ৬ ফুট লম্বা, ওজন নিশ্চয় ১৮০ পাউণ্ড, অনবদ্য দেহসৌষ্ঠব।···তাঁর কণ্ঠস্বর কোমল এবং সুনিয়ন্ত্রিত। ইংরেজি বলেন অদ্ভুত ভালো। বস্তুতপক্ষে অধিকাংশ আমেরিকানদের চেয়ে ভালো তাঁর ইংরেজি।"

চিকাগো ইণ্টারওমান : "ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য সৌজন্যপূর্ণ মনোযোগ আর কেউ আকর্ষণ করতে পারেননি। তার মূলে তাঁর চিত্তহারী ব্যবহার, তাঁর শক্তিসামর্থ্য, নিজ ধর্মের সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁর নির্ভয় আলোচনা ···সব ধর্মের সত্য স্বীকারে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক, ন্যায় ও সামর্থ্য ও পুণ্যের পক্ষে প্রচেষ্টায় সদা প্রস্তুত, কিন্তু একই সঙ্গে এমন বাগ্মিতার দ্বারা হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করেছেন যে, তা কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভ্রম আকর্ষণ করেনি, তাঁর শিক্ষার বিষয়েও বিবেচনার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।"

ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড : "প্রাচীন বৈদিক ঋষির কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল আবার, হিন্দু সন্ন্যাসী পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে, যখন গতকাল সন্ধ্যায় তিনি মধুময় ভাষায় প্রেম ও সহিষ্ণুতার কথা বলছিলেন, আর শত শত শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনছিল।"

হার্টফোর্ডস্ ডেইলি টাইমস : "গতকাল রাতে বিবেকানন্দ অতি চমৎকার সভাগৃহে অভ্যর্থিত হয়েছেন।···তথাকথিত অনেক খৃষ্টানের তুলনায় তাঁর মতের সঙ্গে স্বয়ং যীশুখৃষ্টের মতাদর্শের বেশি ঐক্য আছে। তাঁর উদার হৃদয় সকল ধর্ম ও সকল জাতিকে গ্রহণ করে। গতরাত্রে প্রদত্ত তাঁর সরল ভাষণ অত্যন্ত মনোহারী।"

রাদারফোর্ড আমেরিকান : "নিশ্চয়ই অসাধারণ আকর্ষণ।···আকর্ষণের হেতু হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বক্তৃতা শুনতেই আসা। চিকাগো-ধর্মমহাসভায় এই সন্ন্যাসীর উচ্চ চিন্তাপূর্ণ বাগ্মিতা কেবল সেখানকার শ্রোতাদের ওপরও নয়, সমগ্র ধর্ম-পৃথিবীর ওপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।"

অ্যাপিল অ্যাভালাঞ্চ : "'বক্তৃতামঞ্চের অন্যতম অতিমানব' 'তিনি তাঁহার জাতির আদর্শ মুখপাত্র', 'বিশ্বমেলার অন্তর্ভুক্ত মহাসভার ইনি অতি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি', 'দৈবশক্তিসম্পন্ন বাগ্মী ইনি'—এই সমস্ত এবং এতদপেক্ষাও অধিকতর বিশেষণ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রযোজ্য।"

এমনিভাবে পাশ্চাত্ত্যের অধ্যাত্ম-গগনে বিবেকানন্দ-বিজয়শঙ্খ বেজে উঠলো। বিবেকানন্দ ঝড় তুললেন পাশ্চাত্ত্যের জনমানসে। তিনি আখ্যাত হলেন 'সাইক্লোনিক হিন্দু' নামে। সেই 'সাইক্লোনিক' সন্ন্যাসীর দাপটে পাশ্চাত্ত্যের বহুযুগ সঞ্চিত সুপ্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও সে দেশের যাজককুল বা মিশনারিদের হিন্দুধর্মের প্রতি উন্নাসিকতার ফলশ্রুতি কল্প-কাহিনী-

গুলিও ধুয়েমুছে গেল। আর সেই অত্যাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার টানে এলেন পাশ্চাত্ত্যের এক দল সেরা মানুষও। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের কথা আগেই বলা হয়েছে, তাছাড়া উইলিয়াম জেমস, ইঙ্গারসোল, নিকলাস টেস্‌লা, স্যার উইলিয়াম টমসন (লর্ড কেলভিন), অধ্যাপক হেলমহোলজ, হিরাম ম্যাকসিম, প্রিন্স ক্রপটকিন, ম্যাক্সমূলার, পল ডয়সন, পিয়ের হিয়াসিন্থ, জুল বোওয়া, প্যাট্রিক গেডেস, মাদাম কালভে, সারা বার্নহার্ড প্রভৃতি আমেরিকা ও ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক নেতা কবি ও শিল্পীদের সঙ্গেও স্বামীজীর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। আবার মিস মার্গারেট নোবেল (সিস্টার নিবেদিতা) সিস্টার ক্রিস্টিন, মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষাব্রতী ও বিদুষী মহিলারাও এলেন বিবেকানন্দ-সান্নিধ্যে ; হলেন বিশেষভাবে প্রথমে বিবেকানন্দভাবে ভাবান্বিতা এবং পরে ভারত-কল্যাণে উৎসর্গীকৃতা।

আর স্বয়ং বিবেকানন্দের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে কী হলো? ভারতেও সেই বিবেকানন্দ-জয়-শঙ্খ ধ্বনিত হলো, তবে একটু দেরিতে এবং সে অনেক কাহিনী—উনবিংশ শতকের ভারতীয় 'রেনেসাঁসে' সেগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ যেন ঠিক রূপকথার নায়কের মতোই বহুযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে ভারতরানী বা ভারতের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রাণ-পাখিটি উদ্ধার করে ভারতের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তোরণ-দ্বারে তার প্রতিষ্ঠা করে গেলেন।

আজ একথাই বারবার মনে হয়, বিবেকানন্দ নিজেই যেন এক ব্রহ্মাণ্ড। যে দিকে তাকানো যায় তাঁর অন্ত নেই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, দর্শনে-মননে আজও তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। অন্তত একাধারে এই সমন্বয় নিশ্চয়ই বিরলদৃষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রথিতযশা অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের যে কথা মনে হয়েছিল অর্থাৎ 'বিবেকানন্দ হলেন অতুলনীয় এক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব', আজ ঠিক এক শতাব্দী পরে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীজনের বিবেকানন্দ-মূল্যায়নে সেই কথাই প্রতিধ্বনিত করে। বৌদ্ধিকজগতে তাঁর এই প্রশস্তি বা প্রসারতার যদি বা পরিমাপ করা যায় (যথার্থই যায় কী! 'সম্ভব হতো যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকতেন'—বিবেকানন্দেরই এই স্বগতোক্তি!) কিন্তু হৃদয়বৃত্তিতে বা হৃদয়ের প্রসারতায় তাঁর কোনো পরিমাপ হয় না বা হওয়া সম্ভব নয়। সেই বিশ্বগ্রাসী ভালোবাসায় তিনি আজও এক এবং অনন্য! বলেছিলেন যে, জগতে যতদিন একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে ততদিন তিনি নিজের মুক্তিলাভ (মোক্ষপ্রাপ্তি) চান না! বিবেকানন্দের মহান আত্মা যেন করুণায় বিগলিত হয়ে বিশ্বচরাচরকে আলিঙ্গন করবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ।

কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ

কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ ফিরে এসেছেন পাশ্চাত্ত্যে ভারতের সনাতন ধর্মের বিজয় কেতন উড়িয়ে। তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য চারদিকে সাজ-সাজ রব। দক্ষিণ ভারত এই বিজয়ী বীরকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে রাজকীয় মহিমায়। এবার কলকাতা তাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষায়। ঘরের ছেলেকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জমকালো এক সম্বর্ধনা কমিটি গঠিত হল সেকালের কলকাতার সেরা মানুষদের নিয়ে।

এই কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন—সভাপতি: হিজ হাইনেস দ্বারভাঙ্গার মহারাজ। সহ-সভাপতি: মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, কে-সি-আই-ই; মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর; রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব-বাহাদুর; রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুর; স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, কে-টি। সদস্যগণ: রাজা শিবচন্দ্র ব্যানার্জি; কুমার নিত্যানন্দ সিংহ; ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সি-আই-ই; মাননীয় জয়গোবিন্দ লাহা; রায় শিউবক্স বগলা বাহাদুর; মাননীয় রায় আনন্দ চার্লু বাহাদুর; কুমার রাধাপ্রসাদ রায়; রমানাথ ঘোষ; নন্দলাল বসু; পশুপতিনাথ বসু; মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; রায় কৈলাসচন্দ্র মুখার্জি বাহাদুর; রায় প্রসন্নকুমার ব্যানার্জি-বাহাদুর; কালীনাথ মিত্র; গণেশচন্দ্র চন্দ্র; শালিগ্রাম সিং; এন. এন. ঘোষ; মতিলাল ঘোষ; রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর; কিরণচন্দ্র রায়; রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ. বি, এল; পণ্ডিত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার—অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ; পুলিনচন্দ্র রায়—নাড়াইলের জমিদার; গিরিজানাথ রায়চৌধুরী—সাতক্ষীরার জমিদার; রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী—বরিশালের জমিদার; গুরুপ্রসন্ন ঘোষ; অনাথনাথ মল্লিক; কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র; ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ও শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী [এঁরা তিনজনেই ছিলেন হাইকোর্টের উকিল]; পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ; পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি; পণ্ডিত উমাচরণ তর্করত্ন—সংস্কৃত কলেজ ও রিপন কলেজের অধ্যাপক; জি. সি. বসু, এম-এ; মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ; দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ; প্রিয়নাথ মল্লিক; জে. ঘোষাল; রায় রামশঙ্কর সেন-বাহাদুর; ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ. বি-এল, অ্যাটর্নি; আশুতোষ বিশ্বাস; রামতারণ ব্যানার্জি; ডাঃ আশুতোষ মুখার্জি—হাইকোর্টের উকিল; চারুচন্দ্র মিত্র; পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, এম-এ; পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী—সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক; শেঠ দুলালচাঁদ; জানকীনাথ রায়; শরচ্চন্দ্র মিত্র; এন. শ্রদ্ধানন্দ ভিক্ষু (বৌদ্ধ পুরোহিত); [নাট্যকার] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও ভবানীচরণ দত্ত

বিবেকানন্দের প্রাণ-স্পন্দনে শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা জেগে উঠেছে। এই সেই কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ—যাঁর উদাত্ত আহ্বান- বাণীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতিমধ্যেই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়, বিশেষত যুবসম্প্রদায় তেতে উঠেছে এক নবীন চেতনার আলোকে—'অভীঃ' মন্ত্রে। সেই 'আগুনের পরশমণির ছোঁয়ায়' সহস্র সহস্র যুবক দেশমাতৃকার সেবায়—পরাধীন ভারতমাতার মুক্তিযজ্ঞে আত্মবলিদানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং এই কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দই সেদিন পরাধীন ভারতের জনমানসে অবিসংবাদিতভাবে জাতীয় জাগরণের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হলেন। না—বিবেকানন্দ আজ স্বাধীন ভারতেও অবিসংবাদী ও অশরীরী নেতা—জাতীয় যুবনেতা। দেহত্যাগের প্রায় একশো বছর পরেও স্বামীজী আজ এই সম্মানে ভূষিত। তার জন্মদিনটি (১২ জানুয়ারী) 'জাতীয় যুবদিবস' হিসাবে স্বাধীন ভারতের সরকার দ্বারা ঘোষিত।

কলকাতা সেদিন উদ্দীপ্ত। তার বিশ্বজয়ী বেদান্তকেশরী ঘরের ছেলের শুভাগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ কলকাতার জনমানস।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, শুক্রবার—দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে তিনি এলেন বিজয়ী বীরের মতোই। স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে মোম্বাসা নামে এক স্টিমারে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। মোম্বাসা কলকাতার অদূরেই বজবজে নোঙর করে। অভ্যর্থনা কমিটি স্বামীজীর জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বজবজ থেকে সেই ট্রেনে স্বামীজী এলেন শুক্রবারই সকালে শিয়ালদহে। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত পত্রপত্রিকাগুলি বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শে কিরকম উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল তারই একটি নমুনা—২১ ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' বেরোয়—

"গত শুক্রবার সকালে সুমহান হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা ও ইউরোপে দীর্ঘকাল কাটাবার পর প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন শিয়ালদহের

[উভয়েই হাইকোর্টের উকিল] ; যদুনাথ মজুমদার, এম-এ, বি-এল (যশোহর) ; রাধারমণ কর ; নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, বি. এল—হাইকোর্টের উকিল ; এম. এম. গুপ্ত, বি. এ ; চারুচন্দ্র বসু—সম্পাদক মহাবোধি জার্নাল ; প্রমথনাথ কর, অ্যাটর্নি, বিপিনবিহারী ঘোষ, এম-বি ; মনোমোহন বসু ; বিনয়মাধব চ্যাটার্জি ; নিতাইচরণ হালদার, এল-এম-এম ; বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ ; ভারতীপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ ; প্রিয়নাথ মুখার্জি ; নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এল, অ্যাটর্নি ; ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ. বি. এল, শচীন্দ্রনাথ বসু, বি. এ ; কৃপানাথ দত্ত—চেয়ারম্যান, কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটি ; মহেন্দ্রনারায়ণ দে, এণ্টালি ; অমৃতকৃষ্ণ বসু, এল-এম-এম, মহেন্দ্রনাথ, এল-এম-এম, বরাহনগর ; এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন—অবৈতনিক সম্পাদক, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল—অবৈতনিক সহসম্পাদক।—এই তালিকাটি সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা নরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-এ প্রকাশিত হয়।

রেলস্টেশন উৎসবদিনের রূপ ধরেছিল। শিয়ালদহের স্টেশন প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন স্থানে, নিকটবর্তী সকল রাস্তায়, এককথায় স্টেশনের চতুর্দিকে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। মোটামুটি হিসাবে ২০,০০০ লোক সমবেত হয়েছিল; সমাজের সর্বস্তরের লোক এসেছিল স্বামীজীকে সম্মান ও হৃদয়ের অভ্যর্থনা জানাতে। সমস্ত পথটি ধ্বজপতাকা, পত্রপুষ্প এবং বিজয়তোরণে সজ্জিত ছিল, যার উপরে স্বাগত বাণী লিখিত। পথিপার্শ্বে সকল বাড়ির বারান্দা, ছাত নরনারী ও শিশুতে বোঝাই। ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে। চতুর্দিকে তখন উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব, কিভাবে এগিয়ে তাদের বর্তমান 'হিরো'র কাছে উপস্থিত হওয়া যায়। বিস্তৃত প্ল্যাটফর্মেও জনতার এমন প্রচণ্ড চাপ যে, কষ্টে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে দৃশ্য অতি গরিমাময়, যা ঐস্থানে পূর্বে কখনও দেখা যায় নি, ব্যতিক্রম কেবল এই স্টেশনে লর্ড রিপনের আগমনের সময়ের ঘটনা। ঐ মহান ও জনপ্রিয় ভাইসরয়কে অসাধারণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। স্বামীজীর জন্য অনেক জায়গাতেই বিজয়তোরণ নির্মিত হয়েছিল। ঐসব তোরণের ওপর নহবত বসেছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতীয় মঙ্গলরাগিণী। স্টেশন থেকে রিপন কলেজ পর্যন্ত পথ পত্রপুষ্পমাল্যে সজ্জিত। সঙ্গে সেই সঙ্গে সর্বত্র কনসার্টে নির্বাচিত সুরবিস্তার মোহিত করছিল সকলকে। কয়েকটি সংকীর্তনের দলও উপস্থিত। স্বামীজী কামরা থেকে অবতরণ করামাত্র বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা সমিতি গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে একটি ফিটনে নিয়ে গিয়ে তোলেন। স্বামীজীর সঙ্গী এক ইউরোপীয় দম্পতিকেও [মিঃ ও মিসেস সেভিয়র] গাড়িতে তোলা হয়। স্বামীজী এবং তার বন্ধু ও শিষ্যদের মাল্যভূষিত করা হয়। তারপর তাদের নিয়ে ফিটন যখন ধীরে বিরাট জনমণ্ডলী ভেদ করে অগ্রসর হল, তখন হর্ষধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। স্বামীজীর পশ্চাতে চলল বাদকদল ও সংকীর্তন দলগুলি। তারপর গাড়ির স্রোত। সারা পথে উচ্চ উল্লাসধ্বনি।"

'বিবেকানন্দকী জয়!' —বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে কলকাতার রাজপথ মুখরিত। কলকাতায় রিপন কলেজে স্বামীজীকে প্রথম সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অগণিত বাঁধভাঙ্গা মানুষ সেইদিন ছুটেছে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মির্জাপুরের রিপন কলেজ পর্যন্ত স্বামীজীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আধুনিককালের কোন রাজনৈতিক সমাবেশেরই তুলনা করা যায় না। অগণিত মানুষ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, স্বদেশী-বিদেশী, এককথায় সব পেশার, সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষই সেইদিন ঘরের বাইরে এসেছেন বিবেকানন্দের দুর্নিবার আকর্ষণে; 'অমৃতবাজার,' 'বেঙ্গলী', 'ইণ্ডিয়ান নেশন' প্রভৃতি পত্রিকাতে বিবেকানন্দের সেই জয়যাত্রার চমৎকার বিবরণ বের হয়! পরাধীন সরকারের দ্বারা পরিচালিত 'স্টেটসম্যান'ও অকুণ্ঠিতভাবেই লেখে

(২০.২.৯৭)—"রেলওয়ে স্টেশন থেকে [মির্জাপুরে] রিপন কলেজ পর্যন্ত পুরো এক মাইল পথ উভয় দিকে পত্রপুষ্প এবং কাগজের শিকলিতে ও পতাকায় সজ্জিত ছিল ; স্টেশনের ঠিক বাইরে সার্কুলার রোডের ওপরে বিজয়তোরণ নির্মিত হয়েছিল, যার ওপরে নহবতখানা এবং গায়ে লেখা 'স্বাগত স্বামীজী'। হ্যারিসন রোডের ওপরে অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত আর একটি তোরণে লেখা 'জয় রামকৃষ্ণ'। তৃতীয়টি রিপন কলেজের সামনে, যার ওপরে কেবল লেখা 'স্বাগতম্' !

বিবেকানন্দের বিজয়-রথ তথা ফিটনগাড়ি কিন্তু ঘোড়ায় টানেনি। এক গভীর উন্মাদনায় সে গাড়ি ছাত্ররাই ঘোড়া খুলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রিপন কলেজ পর্যন্ত। তেমনি একজন ছাত্র কুমুদবন্ধু সেন—বিবেকানন্দ-গত প্রাণ—সেদিন সেই মহাবীরের বিজয়রথ-বাহকদের একজন, তার স্মৃতিকথায় লেখেন—"ভোর পাঁচটার সময়ে স্টেশনে পৌছাই স্বেচ্ছাসেবকরূপে—তখন দেখি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা দায়—এত বিরাট জনতা।...যখন স্বামীজীর স্পেশাল ট্রেন এল, তখন মাননীয় আনন্দ চার্লু ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে পড়েই গেলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা কোনরকমে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। তখন চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাদের আদেশ দিলেন, তোমরা স্বামীজীকে বেষ্টন করে আমরা যে রাস্তা দেখাচ্ছি সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের অনুসরণ করে যাবে। আমরা তদনুসারে স্বামীজীকে ঘিরে-ঘিরে চললাম। ...স্বামীজী পৌঁছনো মাত্র চারিদিকে স্বামীজীর জয়ধ্বনি। চারুবাবু নির্দেশ দিলেন কোচম্যানকে ঘোড়া খুলে দিতে, এবং আমাদের গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে বললেন। স্বামীজী তাতে আপত্তি করলেন। কিন্তু চারুবাবু বললেন, আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছি, আপনার আপত্তি টিকবে না। এরা রিপন কলেজ পর্যন্ত অনায়াসে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।"

ঠিক কথাই তো! যে কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ ঘোর দুর্দিনে সমস্ত জাতিকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্ধকার থেকে আলোতে, ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের লুপ্ত গৌরব, জাতীয় দুর্দিনের সেই নেতাকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার বহন করে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা বা গৌরব অর্জন করতে পারবে না সেই কলকাতারই ছেলেরা, বিশেষত তারা যখন বিবেকানন্দের প্রাণের আগুনেই টগবগ করে ফুটছে !

হ্যাঁ, বিবেকানন্দ কলকাতার ছেলেদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও তার কলকাতা-সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল সর্বসাধারণের দ্বারা, কিন্তু স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল কলকাতার যুবকদের প্রতিই। ২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে কলকাতাবাসীদের তরফ থেকে স্বামীজীকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সে-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতে বলা হয়েছে—"ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নগরীতে এর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি-সমাবেশ হয়নি।...উপস্থিত ছিলেন রাজা ও মহারাজাগণ, সন্ন্যাসীগণ, একদল বিশিষ্ট ইউরোপীয়, সুপরিচিত বহু পণ্ডিত এবং খ্যাতনামা নাগরিক এবং শত শত কলেজ ছাত্র।" এবং সেইসব ছাত্রদের মনে কিরকম উদ্দীপনা ও উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবার তাই

শুনুন। সম্বর্ধনা-সভার ভাষণে স্বামীজী বলছেন—"হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি জ্বালিতে হইবে। লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর। আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি বলিতেছি, উহা উপহাসের বিষয় নয়, কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।...কলিকাতাবাসী যুবকগণ! ওঠো, জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে।...এখন আমাদের সকল বিষয় সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন করো, ভয় পাইও না, কেবল আমাদের শাস্ত্রেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া 'অভীঃ'-- এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভীঃ'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্যে সিদ্ধিলাভ করিব ; ওঠো, জাগো, কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছে। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবে। আর কলিকাতায় এইরূপ শত সহস্র যুবক রহিয়াছে। তোমরা বলিয়াছ, আমি কিছু কাজ করিয়াছি। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, আমি এক সময় অতি নগণ্য বালকমাত্র ছিলাম— আমিও একসময় এই কলিকাতার রাস্তায় তোমাদের মতো খেলিয়া বেড়াইতাম। যদি আমি এতখানি করিয়া থাকি, তবে তোমরা আমার অপেক্ষা কত অধিক কাজ করিতে পারো। ওঠো, জাগো, জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে ; অতএব হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ! হৃদয়ে এই উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া জাগরিত হও।"

ধন্য কলকাতা! কলকাতার বড় গৌরব তার এই বিশ্বজয়ী বীর সন্তানকে নিয়ে। বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শে জেগে উঠেছে পরাধীন ভারতের অবদমিত, লাঞ্ছিত, হতাশ যুবসম্প্রদায়। ভারতীয় 'রেনেসাঁসে'র চরম উত্তেজনার মুহূর্ত সেসময়। বিবেকানন্দের আহ্বানে শত সহস্র যুবকদল মাতৃভূমির জন্য কিছু একটা করতে চায়। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য তারা লড়তে চায়, মরতে চায়। আর সেই মহাজাগরণের প্রাণকেন্দ্র—কলকাতা। কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দের আহ্বানে এমনি মহা আকর্ষণ।

আমরা আপাততঃ বিশ্ববিজয়ী কলকাতার ছেলেকে নিয়ে তার আবাল্য পরিচিত কলকাতার কয়েকটি জায়গাতে ঘুরে আসি। জন্মেছিলেন উত্তর কলকাতায়, সিমলা অঞ্চলে, ৩ নং গৌরমোহন ষ্ট্রীটে। পিতামাতা নাম রেখেছিলেন 'নরেন্দ্রনাথ', ডাকনাম 'বিলে'। কলকাতার ছেলে তো, তাই ছোটবেলা থেকেই দস্যি-দামাল। বেসামাল মা ভুবনেশ্বরীর অভিযোগ—"অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" তবে ছেলে জব্দ ঐ শিবের নামেই। মহাক্রোধী ছেলের মাথায় 'শিব, শিব' বলে জল ঢাললেই একেবারে চুপ অথবা যদি ভয় দেখানো হত এই বলে যে, "যদি দুষ্টুমি

করিস তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবে না—" তখন একেবারেই সুবোধ শান্ত !

ছোটবেলা থেকেই 'লিডার' ! খেলাধুলায় সবার সেরা, আমোদ-আহ্লাদে সবার প্রাণ, যাত্রা-থিয়েটারে 'রাজা' সেজে হুকুমদারি তাঁর চাই। তাঁর অবাধ গতিবিধি, সিমলা থেকে গড়ের মাঠ পর্যন্ত। হেতুয়া বা হেদো (আজকের হেতুয়া পার্ক) তো তাঁর ঘরের কাছেই! স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের নিয়ে বেড়ানো, খেলাধুলো সবই করেছেন তিনি সেখানে। ছোটবেলা থেকেই অকুতোভয়। ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সামনে থেকে বাঁচিয়েছেন অসহায় বালককে। কলকাতায় নতুন কিছু হলেই সঙ্গীদের নিয়ে ছোটা চাই। শিশু বয়সেই চাঁদপাল ঘাট থেকে মেটিয়াবুরুজে চলে এসেছেন নৌকায় চেপে। উদ্দেশ্য—লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শার পশুশালা-দর্শন। নৌকার মাঝিরা অহেতুক হাঙ্গামা বাধিয়েছিল তাদের অল্প বয়েস দেখে, মারমুখী মাঝিদের 'টাইট' দিয়েছে সে অদ্ভুত নিপুণতায়। নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে কাছাকাছি দু'জন গোরা সৈনিককে দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে মাঝিদের দুর্ব্যবহার ও তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলতেই ইংরেজ সৈনিকেরা বালকদের পক্ষ নিয়ে মাঝিদের ধমক দিয়েছে। এর কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা বন্দরে একখানা নতুন যুদ্ধজাহাজ ভিড়েছে শুনেই তা দেখতে বন্ধুদের নিয়ে দে-ছুট্ ! জাহাজ দেখতে হলে কলকাতার চৌরঙ্গীতে গিয়ে এক অফিস থেকে অনুমতি আনতে হয়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথদের ছেলেমানুষ দেখে দারোয়ান অফিসের ভিতরে ঢুকতেই দেয় না তাদের। নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধি করে সবার অলক্ষ্যে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভারপ্রাপ্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জাহাজ দেখার অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করে এবং বিজয়ী বীরের মতো অফিসের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। হতভম্ব দারোয়ান জিজ্ঞেস করতেই "তুম ক্যায়সা উপর গিয়া থা ?"—নরেন্দ্রনাথের দুষ্টুমিভরা ছোট্ট উত্তর—"হাম জাদু জানতা !"

এমন না হলে কলকাতার ছেলে ! খেলাধুলা, গানবাজনা শরীরচর্চা সবই তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু আধুনিক কলকাতার ছেলেদের মতো হুজুগে ও মারদাঙ্গা-স্বভাবের কোনদিনই ছিলেন না। তাঁর জয় অন্তরের সাহসে আর বুদ্ধির কৌশলে —যে বুদ্ধিতে কলুষতা বা কুটিলতা নেই—আছে নিরন্তর উদ্ভাবনী শক্তির চমৎকারিত্ব ! অল্পবয়সে কী তিনি শেখেন নি ? লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, নৌকা বাওয়া, সাঁতার, কুস্তি, এমন কি জিমন্যাসটিকেও তিনি সমান পারদর্শী। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে 'হিন্দুমেলার' প্রবর্তক নবগোপালবাবুর আখড়ায় তিনি প্রায়ই যেতেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানস্পৃহাও অদম্য হয়ে ওঠে। পাঠ্য-পুস্তকের সীমাবদ্ধতা কোনদিন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি সব বিষয়েই পড়াশুনো করতে ভালবাসতেন। এবং তাঁর পড়াশুনার পদ্ধতিটিও ছিল অদ্ভুত

রকমের। তাঁরই কথায়—"এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন লেখকের বই পঙ্‌ক্তি ধরে না পড়েও আমি বুঝতে পারতাম। প্রতি প্যারাগ্রাফের প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি পড়েই তার ভাব ধরতে পারতাম। এই শক্তি যখন আরও বাড়ল, তখন প্যারাগ্রাফ পড়ারও প্রয়োজন হত না; প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তি পড়েই বুঝতে পারতাম। আবার যেখানে কোন বিষয় বোঝাবার জন্য লেখক চার-পাঁচ বা আরও বেশি পাতা জুড়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, সেখানে গোড়ার দিকের কয়েকটি কথা পড়েই আমি তা বুঝে নিতাম।" এইভাবে দেশী-বিদেশী বহু সাহিত্যই তিনি অল্পবয়সে পড়ে ফেলেছেন, বিশেষত বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পাঠে তাঁর খুবই অভিরুচি। 'মার্শম্যান', 'এলফিনস্টোন' প্রভৃতি লেখকের ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি সাগ্রহে পড়েছেন। যেহেতু অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তাঁর প্রবল, সেজন্য দর্শন বিষয়ে তিনি এক সর্বগ্রাসী পাঠক। 'হার্বার্ট, স্পেনসর' থেকে শুরু করে 'মিল', 'কাণ্ট', 'হিউম', 'হেগেল' কিছুই পড়তে বাদ নেই। সঙ্গীতচর্চাতেও তাঁর অসাধারণ দখল। ধর্মীয় সঙ্গীতে তো বটেই, এছাড়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলতে যা বোঝায়—ঠুংরী, টপ্পা, গজল প্রভৃতিতে তিনি পারদর্শী এবং নিজে একটি সঙ্গীতের বই সম্পাদনাও করেছেন 'সঙ্গীত কল্পতরু' নামে। বাঁয়া তবলা ও পাখোয়াজেও তাঁর নিপুণ হাত।

অল্পবয়স থেকেই বাগ্মী। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) এক পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছেন বাগ্মী-প্রবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এইসব কারণে ছোটবেলা থেকেই এক সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে তাঁর সুগভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা। কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই বা শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে নয়, 'ঈশ্বর আছেন কি নেই'—এসব আলোচনার দ্বারা নয়, ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়েছেন—তেমন মানুষকেই তিনি খুঁজে বেড়ান কলকাতার পথেঘাটে। সবাই অনেক-অনেক শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দেন, ব্রহ্ম-ঈশ্বর-মায়া নিয়ে অনেক তর্কজাল বিস্তার করেন, কিন্তু কেউ তাঁরা ব্রহ্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর-দর্শন করেন নি। নরেন্দ্রনাথ কলকাতার বিশেষ বিশেষ উপাসনাগারে, ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যাতায়াত করেন, কিন্তু সবাই নীতিবাগীশ, তাঁর প্রশ্নের সরাসরি সদুত্তর কোথাও নেই। সব দেখেশুনে তিনি হতাশ, এবং একসময় কিছুটা নাস্তিকই হয়ে পড়েন পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাবে।

এমন সময় সেই অঘটন ঘটল। এবং অঘটন ঘটালেন এক পাশ্চাত্ত্য সাহেবই। নরেন্দ্রনাথ তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, পড়েন জেনারেল এসেম্বলী কলেজে। ঐ কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি সাহেব, পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। এবং ঘটনাটি 'ওয়ার্ডসওয়ার্থে'র একটি কবিতা নিয়ে ঐ কলেজেরই এক অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিণাম। সেই বিখ্যাত কবিতাটির নাম 'এক্সার্শন'—যে

কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে কবির বিচরণের কথা আছে। এবার সেই ছাত্র-শিক্ষক-দ্বন্দ্বের কথাটি সুন্দরভাবে শোনা যাক নরেন্দ্র-নাথেরই এক সহপাঠীর কাছ থেকে ; তাঁর নাম হরমোহন মিত্র। তিনি বলেন—"একদিন আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক সাহেব ছেলেদের ওপর খুব চটে যান, ছেলেরা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা বুঝতে পারছিল না। তিনি বিরক্তি-ভরে টেবিল চাপড়িয়ে, পা রাখবার পাদানিতে পদাঘাত করে অবশেষে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ঠিক এইসময় আমিও একটা কাজে বাইরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম অধ্যক্ষ মাননীয় হেস্টি সাহেব ক্লাসের দিকে আসছেন। আমি ফিরে এসে হেস্টি সাহেবের বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'অমুক অধ্যাপক বলেন ছাত্ররা বোকা এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাব ধরতে পারে না। হয়ত তিনি নিজেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বোঝেন না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মাঝে মাঝে সমাধি (trance) হয়ে যেত, ইত্যাদি।' বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, 'এমনি ধরনের এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে আছেন যিনি সমাধিপ্রাপ্ত হন। তোমরা গিয়ে তাঁকে দেখে এসো।' ক্লাসের ছাত্ররা সেই প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনল।" (ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের Vivekananda : Patriot Prophet দ্রষ্টব্য)।

হ্যাঁ, এরপর সংশয়ী কলকাতার ছেলে নরেন্দ্রনাথ এলেন দক্ষিণেশ্বরে, দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং 'পড়াশুনায়, খেলাধুলায়, গাইতে-বাজাতে' ওস্তাদ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই হার মানলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল'দের, ভাষায় যাকে বলে একেবারে 'বোল্‌ড আউট' হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই প্রথম শুনলেন নরেন্দ্রনাথ যে, ঈশ্বরকে দেখা যায়। তিনি স্বয়ং দেখেছেন। এবং নরেন্দ্রনাথকেও দেখাতে পারেন। দেখালেনও।

ব্যস্, কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দের সেই 'টারনিং পয়েন্ট'! বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ কিন্তু সেদিন নরেন্দ্রনাথরূপে বিজিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই তাঁর আদরের 'নরেন্দ্র' প্রথম বিশ্ববিজয়ের তকমা পেলেন তাঁর এই ভবিষ্যৎ-বাণীর মধ্য দিয়েই—"নরেন [লোক] শিক্ষে দিবে!"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের যন্ত্র কলকাতার ছেলে নরেন্দ্রনাথ থেকে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের এই যে রূপান্তর—তা আজ বিদগ্ধ সমাজের গবেষণার বিষয়। ঘটনার বাহুল্যে এবং চমৎকারিত্বে কলকাতার ছেলের এই বিশ্বজয় বুঝি উপন্যাসকেও হার মানায়। পাশ্চাত্যবাসিনী বিদুষী লেখিকা মিসেস মেরী লুই বার্ক তাঁর বিশাল গবেষণামূলক গ্রন্থ Swami Vivekananda in the West-এ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য-জয়ের কাহিনী নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এবং দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই পতাকাবাহী। স্বামীজীর পাশ্চাত্য-গমনের উদ্দেশ্য ও তার সফলতা নিয়ে লেখিকার আকর্ষণীয় উক্তি—"Thus assured that the proposed journey was sanctioned by God, Swami

Vivekananda, of whom Sri Ramkrishna had once said : 'The time will come when he will shake the world to its foundation through the strength of his intellectual and spiritual powers'..."

হ্যাঁ, সত্যিই বিবেকানন্দ বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে এবং বাগ্মিতায়। চার বছর পরে সেই কলকাতার ছেলে ফিরে এসেছে এবং কলকাতা তাঁরই সম্বর্ধনা জানাতে মেতে উঠেছে। সে কলকাতা হুজুগের নয়, উৎসবের—যে উৎসবে ঊনবিংশ শতকের 'রেনেসাঁসে'র অগ্রদূতের জয়ধ্বনিই শোনা গেছে দিকে-দিগন্তে।

সে জয়ধ্বনিতে কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ কিন্তু আত্মগরিমায় ফেটে পড়েননি। কলকাতার বাটিতে প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—যিনি তাঁর অন্তরাত্মাকে জাগিয়েছেন এবং যিনি তাঁর জীবনের কর্মযজ্ঞের মূল প্রেরণাদাতা। কলকাতা-অভিনন্দনের উত্তর দেবার সময় সেই শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর হৃদযতন্ত্রীতে বেজে উঠেছেন বার বার। উদাত্ত-কণ্ঠে বলেছেন—"ভ্রাতৃগণ! তোমার আমার হৃদয়ের আর একটি তন্ত্রীতে—গভীরতম স্বরের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছ, আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়-মনোবাক্যে আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বাহির হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতে কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহারই। কিন্তু যদি আমার জিহ্বা কখনো অভিশাপ বর্ষণ করিয়া থাকে, যদি আমার মুখ হইতে কখনো কাহারো প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বাহির হইয়া থাকে তবে তাহা আমার, তাঁহার নহে। যাহা কিছু দুর্বল, যাহা কিছু দোষযুক্ত—সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং।"

শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষকে যদি জাগতে হয়, তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে হয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকাতলে একদিন আসতেই হবে সমগ্র জাতিকে—এ-ছাড়া অন্য কোন পথ নেই—সেই দৃঢ় প্রত্যয়ই বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে, বলেছেন—**"If this nation wants to rise, it will have to rally enthusiastically round his name. It does not matter who preaches Ramkrishna Paramahansa, I or you or anybody else. But him I place before you to judge, and for the good of our race, for the good of our nation, to judge now what you shall do with this great ideal of life."**

দেশে ফিরেও তাই তাঁর ছুটি নেই, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করার কথাই ভেবেছেন তিনি সবসময়। তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। যদিও কলকাতা তাঁর প্রাণকেন্দ্র—কিন্তু ততদিনে কর্ম তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে বিবেকানন্দ-আন্দোলন। রাজনীতিতেও পরোক্ষভাবে বিবেকানন্দ-প্রভাব অস্বীকার করা যায় না বিশেষত প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে। কলকাতাতেই কত কাজ করে গেছেন, কত বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নিয়েছেন, তার সবকিছু রূপায়ন স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা, সুদূর আমেরিকা থেকে ভগিনী নিবেদিতাকে এনেছেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা তথা নারী-জাগরণ ঘটাবার জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় মেয়েদের জন্য স্কুল-স্থাপনা [আধুনিককালে যার মহীরুহ রূপ—"নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়"]। শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে এক সন্ন্যাসিনী-সংঘ [আজ যার বাস্তবায়িতরূপ "শ্রীসারদা মঠ ও মিশন] আর এ সবের সঙ্গে সেবামূলক কাজকর্ম তো তাঁর নিরন্তর ধ্যানের মতোই ছিল। আর্ত ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা, অচ্ছুৎ সেবা, জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আবার কলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী-ভাইদের নিয়ে যেভাবে আর্তসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তা পরাধীন ভারতের বিদেশী শাসকও প্রশংসা না করে পারেনি।

স্বামীজী স্বদেশে ফেরার এক বছরের মধ্যেই কলকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। স্বামীজীর হাতে তখন অনেক কাজ, সংঘ-পরিচালনা, জনসংযোগ, বক্তৃতা-সফর, এমন কি সেইসময় তাঁর বিদেশ থেকে ঘনঘন আমন্ত্রণ আসছিল দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য-সফরের জন্য। কিন্তু স্বামীজী সমস্ত কিছু বাতিল করে দেন কলকাতায় প্লেগের ভয়াবহতার কথা ভেবে। পাশ্চাত্ত্যবাসিনী বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রিতা মিস্ ম্যাকলাউড আগেই একটি চিঠি পান স্বামীজীর কাছ থেকে (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮), লিখেছেন—"কলকাতায় যদি প্লেগ শুরু হয় তবে আমার কোথাও যাওয়া হবে না। আমি যে শহরে জন্মেছি, সেখানে যদি প্লেগ এসে পড়ে. তবে তার প্রতিকারকল্পে আত্মোৎসর্গ করব বলে স্থির করেছি।"

স্বামীজীর আশঙ্কাই সত্য হয়। কলকাতায় প্লেগের সূচনা হল। স্বামীজীর মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। সে কথা স্মরণ করে স্বামী অখণ্ডানন্দজী পরবর্তীকালে বলেন—"স্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হল, কিন্তু তাঁরা কোন রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না। একটা বালিশের ওপর মাথা গুঁজে সারাদিন বসে রইলেন, তারপর শুনলাম, কলকাতায় প্লেগে নাকি তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে, শুনে অবধি এই অবস্থা।" স্বামীজী অবিলম্বে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য অনুগামীদের নিয়ে এক সভা করেন এবং

সেখানে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন—"দেখো আমরা সকলে ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব প্লেগ রোগীদের সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের নূতন মঠের জমিও যদি বিক্রি করে দিতে হয়, আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত।"

স্বামীজীর নির্দেশে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর সেবা-শুশ্রূষা সবই তাঁরা করেছেন অকুতোভয়ে। ভয়ত্রস্ত পলায়মান কলকাতাবাসীদের মধ্যে হাজার হাজার প্রচারপত্র ছাড়া হয় তাদের অভয় দেবার জন্য। প্রচারপত্রের অভয়-বাণী—"মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারংবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।...জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন, ভয় নাই! ভয় নাই!"

এই সময় কলকাতাবাসীরা সবিস্ময়ে দেখে, ঝাঁটা হাতে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা অক্লান্তভাবে পরিষ্কার করে চলেছেন অন্যান্যদের সঙ্গে স্বামীজীর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতাও। সেই মহাদুর্দিনে কত অসহায় পিতাকে যে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে তা জানা যায়। সেই দুর্দিনে আর একজনের নাম করতে হয়—স্বামী সদানন্দ, 'গুপ্ত মহারাজ' নামে সমধিক পরিচিত। বিবেকানন্দ-শিষ্য তরুণ সন্ন্যাসী সদানন্দ সেদিন বেপরোয়া—স্বামীজীর আশীর্বাদে তখন জীবন-মৃত্যু তাঁর পায়ের ভৃত্য। প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেন এই সময় সদানন্দের কাজের নিত্যসঙ্গী। একদিনের ঘটনায় তিনি লেখেন—"অতি প্রত্যুষে মেথর জমাদার জোগাড় করিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। কাঠমার বাগানের বস্তী—প্রকাণ্ড বস্তী—মসজিদবাড়ি ষ্ট্রীটে। বাইরে মুদিখানা আর খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময়, আর দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যেদিকে উৎকট দুর্গন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাদের ডাকিয়া লইলেন। বস্তীর সংলগ্ন একটি সংকীর্ণ খালি জমি—সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা। এই খালি বাড়ির পাশেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। যতকিছু আবর্জনা সব পচিয়া দুর্গন্ধ।

"গুপ্ত মহারাজ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেই বলিতে লাগিলেন—উক্ত অট্টালিকাবাসীদের উদ্দেশ করিয়া গালিগালাজ দিয়া বলিলেন—'দেখছো, এই তো ভদ্রসমাজের কাণ্ড। এইসব রোগের বীজ এই গরীবদের বাসস্থানে ফেলে মহামারীর বীজ ছড়াচ্ছে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা যতকিছু ব্যয়রাম এই আবর্জনা পচে হয়।"

সেই পচা দুর্গন্ধের বোঝা দেখে ঝাড়ুদাররাও নাকে কাপড় চাপা দেয়। এবং সেই জঞ্জাল পরিষ্কার করতে তারা পুরোপুরি অসম্মতি জানায়। গুপ্ত মহারাজ

মরীয়া, তিনি নিজেই ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে মাথায় কাপড় বেঁধে কাজে নেমে পড়েন, সঙ্গে কুমুদবন্ধু সেন। ঝাড়ুদারদের বলেন, "বেশ ভাইয়া, তোমরা বসে বসে দেখো, আমি সাফ করছি।"

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর জঞ্জাল-সাফাই দেখে ঝাড়ুদাররা প্রথমে খুবই বিস্মিত, তারপরে লজ্জিত হয়। ক্ষমাপ্রার্থনা করে তারা বলে—"বাবাজি-মহারাজ, আমাদের ক্ষমা করুন, কোদাল আমাদের দিন, আমরা সব পরিষ্কার করছি।"

বীর সন্ন্যাসী তখন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, মান-অপমান, লোকলজ্জা, মৃত্যুভয় সবই তুচ্ছ তখন, বলেন—"না না, আমরা সাফ করব, তোমরা বসে বসে দেখো। আমি তোমাদের যে মজুরি দেব বলেছি, তা সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনের মতো দেব।"

কিন্তু ঝাড়ুদার-জমাদাররা আর যাই হোক, তাদের হৃদয় আছে। তারা তো অট্টালিকাবাসী ভদ্রসমাজের মতো বেশিক্ষণ নাকে কাপড় দিয়ে থাকতে পারে না, এবার তারা সন্ন্যাসীর পায়ে ধরে বলে—"না না বাবাজী, তুমি যখন করছ, তখন আমরা করতে পারব না কেন?" সন্ন্যাসীর হাত থেকে ঝুড়ি-কোদাল কেড়ে নিয়ে তারা সোৎসাহে কাজে লেগে যায়। শ্রমজীবী মানুষদের এই আন্তরিকতায় সদানন্দজী সঙ্গী যুবক কুমুদবন্ধুকে বলেন—"দেখছো, ভদ্রলোকদের চেয়ে এদের প্রাণটা কত তাজা! তুমি করছো তো করছো, তারা গ্রাহ্যও করে না। মুখে হয়ত কেউ বলবে, 'বেশ মশায়, বেশ কাজ করছেন।' এই পর্যন্ত। আর দেখো, প্রাণে লাগল বলেই ওরা হাত থেকে ঝুড়িকোদাল কেড়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলে।...এসো, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কেন, রোগজীবাণুনাশক ওষুধ-গুলি বালতিতে গুলে ছড়িয়ে দিই।"

এরপর একসময় প্লেগ থেমে গেছে। কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ কিন্তু থামেননি। তিনি থামতে পারেন না। তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। তাঁর লড়াই শুধু সামাজিক আধি-ব্যাধির সঙ্গে নয়, তাঁর লড়াই সর্বতোমুখী, তাঁর লড়াই বিশ্বকেন্দ্রিক। সামাজিক অবক্ষয়—অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতির সঙ্গে তিনি আমরণ লড়াই চালিয়ে গেছেন। বলে-ছিলেন,—"নিখিল আত্মার সমষ্টিস্বরূপ যে-ভগবান বিদ্যমান, এবং একমাত্র যে-ভগবানের আমি বিশ্বাসী, ভগবানের পূজার জন্য আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণাভোগ করি। সর্বোপরি আমার উপাস্য—পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।"

সেই সমষ্টি-নারায়ণের সেবার জন্যই তিনি চেয়েছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে একদল মানুষ তাঁর জীবনব্রত উদ্‌যাপনে নিঃস্বার্থভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই কর্মযজ্ঞের সাফল্যে আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন—"একটা ভাব কেবলই আমার মাথার ভিতর ঘুরছিল—ভারতের জনসাধারণের

উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র [প্রতিষ্ঠান] প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। সে-বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। · আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভিতর কাজ করেছে, কলেরা-আক্রান্ত পারিয়ার বিছানার পাশে বসে সেবা-শুশ্রূষা করছে, এবং অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে।…"

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করে মাত্র ৩৯ বছরেই তিনি বাঞ্ছিতলোকে চলে গেলেন। কিন্তু না, কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দের প্রাণস্পন্দন আজও থামেনি। বিবেকানন্দের মৃত্যু নেই—তাঁর মহান আত্মার মুক্তি নেই। স্বেচ্ছায় যে মানবকল্যাণের ব্রত তিনি নিয়েছিলেন, জগতের একটিও দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত প্রাণী অবশিষ্ট থাকতে বিবেকানন্দের আপসহীন সংগ্রাম চলতেই থাকবে। তাই বিবেকানন্দ আজও সদা জাগ্রত তাঁর মহান ব্রত উদযাপনে। এ তাঁর নিজেরই কথা—"It may be that I shall find it good to get outside my body—to cast it off like a worn-out garment. But I shall not cease to work until the whole world shall know that it is one with God."

তাঁর এই কথাতেই আমরা নিঃসন্দেহ যে, কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ আমাদের ছেড়ে চলে যাননি—তিনি আজও জাগ্রত আমাদের দ্বারে তাঁর সহযোগিতার হাত দুটি বাড়িয়ে।

চির-প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ

১২ জানুয়ারী, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব। ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি দিনটি 'জাতীয় যুব দিবস' হিসাবেও পালিত হয়।

মনে পড়ে, ধর্মক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ২৮ বছরের যুবক বিবেকানন্দের সম্বন্ধে সেসব দেশের মনীষীদের অভিমত ছিল—'বিবেকানন্দ বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় প্রবীণ,' আর আজ তাঁর ১২৭ বছর পরেও সেই কথাই বলতে হবে। কারণ স্বামীজী আজ কেবল যুব সম্প্রদায়ের নয়, নবীন ভারতের—প্রগতিশীল তথা উন্নতিশীল ভারতের অবিসংবাদিত দিশারী।

আজ মনে পড়ে, সেই ২৮ বছরের যুবকের অবিস্মরণীয় উক্তিটিও—"এখন আমার শুধু একটিমাত্র চিন্তার বিষয় আছে—আর সে হল ভারত। আমি তাকিয়ে ভারতের অভিমুখে—শুধু ভারতের দিকে—।"

পাশ্চাত্যের "সাইক্লোনিক হিন্দু" স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ ফেরার পথে এই কথাই বলেছিলেন তাঁর অনুগামী এক ইংরেজ দম্পতিকে। পাশ্চাত্য জনমানসে যে ঝড় তিনি বইয়ে গেলেন, হিন্দুধর্মের বিজয়-পতাকাটি উড়িয়ে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তিনি পেলেন সেখানে—তাতে অনেকেরই মনে এই সংশয় দেখা দিল যে, এরপর হয়ত তিনি স্বদেশে ফিরতে কুণ্ঠাবোধ করবেন। একজন তো সরাসরি তাঁকে সেই প্রশ্নই করে বসলেন—"বিলাসপূর্ণ ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান পাশ্চাত্য-দেশে চার বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর এখন আপনার মাতৃভূমি আপনার কাছে কেমন লাগবে?" কিছুমাত্র ইতস্তত না করে সেই যুবক-সন্ন্যাসী তাঁর মাতৃভূমির প্রতি হৃদয়-উজাড়-করা মমত্ব দিয়ে বললেন—"দেশ ছেড়ে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম; এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; ভারত এখন পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র!"

পাশ্চাত্যের সেই 'সাইক্লোনিক হিন্দু' উনবিংশ শতকের ভারতীয় "রেনেসাঁসে" ঠিক সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই নতুন যুগের অভ্যুদয়ে ভারতের হীনদশা ও পুঞ্জীভূত কালিমা ধুয়ে মুছে যখন 'প্রাণভরা ঝড়ের মতন, উর্ধ্ববেগে' সেই বিজয়ী বীরের আবির্ভাবে ভারত তার হৃতগৌরব ফিরে পেল তখন যেন ঝঞ্ঝামুখর 'বর্ষশেষ'-এ মহাকবির কণ্ঠে নতুন দিনে এক দিগ্বিজয়ী মহাবীরের আগমনী-বার্তাই ধ্বনিত হল দিকদিগন্তে—

"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজ-সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাই বুঝিলাম
জয় তব জয়।"

(রবীন্দ্রনাথ)

অথবা "নবযুগে"র অন্য এক কবি মোহিতলালের ভাষায়—"এ যেন সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া সহসা [নবযুগের] এক পর্বতচূড়ার অভ্যুদয় হইল ; [রেনেসাঁসের] যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল তাহারই এক শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল।"

'মাভৈঃ!'—'আকাশ-জুড়ে' 'বজ্রমন্ত্রে' ভারতের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে বিবেকানন্দের এই অভয়মন্ত্র শোনা গেল। সহসা এই তরুণ যোগীর আহ্বানে জাতি আবার জেগে উঠল। তাঁকে যোগী না বলে প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত যোদ্ধা। একদিকে যেমন অপরিমেয় আ্যাধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, আবার দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক শক্তিতেও তিনি সে সময় অতুলনীয়। কাজেই সে সময় ভারতবাসীরা, বিশেষত যুবসমাজ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দেশে তখন নানা সমস্যা ও জটিলতা। সবাই পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি চাইছে, ধর্মীয় কুসংস্কারও তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সেই সুযোগে বিদেশী শক্তি তথা শাসক ইংরেজও নানাভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছে। যুবসমাজ হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত। কিন্তু তারা জেগে উঠতে পারছে না প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে। সব অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তারাও একটা লড়াই দিতে চায়। কিন্তু নেতা কোথায়? আদর্শ কোথায়? সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। যাঁর আদর্শে আছে ভারতপ্রেমের নিষ্ঠা, কথায় আছে দেশপ্রেমের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর ধর্মবোধে যিনি সবরকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে—উদার বৈদান্তিক মনোভাবাপন্ন। যুবসমাজ রোমাঞ্চিত হত তাঁর দৃপ্ত ভাষণে—**A hundred thousand men and women, fired with the zeal of holiness,. fortified with the eternal faith in the Lord and nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the down-trodden, will go over length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up—the gospel of equality."**

ত্রিশ কোটি পরাধীন ভারতবাসীর, আরও বিশেষ করে যারা অবদমিত, অজ্ঞ দীন-দরিদ্র, তাদের উদ্ধারের দায়-দায়িত্ব স্বামীজী দিয়েছিলেন ভারতীয় যুবকগণকেই—**"I bequeath to you, youngmen, this sympathy, this**

struggle for the poor, the ignorant, the oppressed···Vow then to devote your whole lives to the cause of the redemption of these three hundred millions, going down and down every day."

পরাধীন ভারতবর্ষের যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর এই হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো তাদের মর্মমূলে তীব্র আঘাত দিয়েছেন তাদের মধ্যে কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার ভাব লক্ষ্য করে। সবরকম বিভেদ-বিচ্ছেদ, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ভুলে যুবসমাজকে এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে তিনি উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশের সেই দুর্দিনে সংহতিহীন কলহপ্রিয় যুবকগণের প্রতি তাঁর ধিক্কারের ভাষাও ছিল তেমনি তীব্র—"আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি—আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল, আমরা অলস, আমরা কাজ করিতে পারি না, আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না ; আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না ; আমরা ঘোর স্বার্থপর ; আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি, ঈর্ষা করিয়া থাকি। আমাদের এখন এই অবস্থা—আমরা অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন, ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি···"

ভাবতে অবাক লাগে, আজ আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির চার দশক পরেও ভারতের যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর এই উক্তি কত প্রাসঙ্গিক। আমাদের ছাত্রযুবসমাজের একটা বড় অংশ এখনও এই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলতা তথা উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার। এই কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাই এর একটা বড় কারণ মনে হতে পারে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা বা শিক্ষাব্যবস্থায় অনেকক্ষেত্রে ছাত্রদের অপরিণত মনে পাঠ্য-পুস্তকের গুরুভারের মতো রাজনীতির গুরুভারও চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফল প্রায়ই শুভ হয় না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। বরঞ্চ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা স্বামীজীর কথাই প্রতিধ্বনিত করে—'মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না। অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না।" সমাজজীবনে আমরা শিক্ষার প্রায়োগিক দিকটা সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। গুরুভার সম্বলিত পুস্তক মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ ও তথাকথিত শিক্ষিত বলে গণ্য হওয়া আর অধীত বিদ্যার দ্বারা সুশৃঙ্খল জীবন ও চরিত্র গঠন করা এক জিনিস নয়। শিক্ষার এই প্রায়োগিক দিকটাও স্বামীজীর কথাতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত—"বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পারো, তবে যে ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।"

বর্তমানে যেন-তেন-প্রকারেণ পরীক্ষাপাশের হিড়িকে ছাত্রযুবসমাজকে এমনভাবে অবহিত করার দায়দায়িত্ব প্রায় কেউই গ্রহণ করেন না এবং এর ফলে শৈশব থেকেই তাদের মনে নৈতিক থেকে অর্থনৈতিক ভাবটিই প্রবলভাবে জেগে থাকে এবং পরিশেষে দরিদ্র ভারতবর্ষে এদের একটা বড় অংশ দিশেহারা হয়ে হতাশার শিকার হয়। আমার মতে, ভারতবর্ষের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার খোল-নলচে পাল্‌টে যদি প্রথমাবধি চরিত্রগঠনের দিকে জোর দেওয়া হয় তবে অনেক সমস্যারই সমাধান করা যেত এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাও আজ এতটা বেসামাল হয়ে দারিদ্র, বেকারত্ব প্রভৃতি বাড়াত না। কারণ, একথা তো সহজেই বোঝা যায় দুর্বল চরিত্রেই কালো টাকা, কালো বাজার, ভেজাল কারবার ইত্যাদির বাসা বাঁধে এবং এইভাবে একশ্রেণীর হাতে প্রচুর টাকা এসে যাওয়ার ফলেই দেশ আজ অর্থনৈতিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। এবং ছাত্রযুবসমাজের নৈতিক চরিত্রগঠনে দেশের রাজনীতিরও একটা বড় ভূমিকা আছে। শিক্ষানীতির ব্যবস্থার মতো রাজনীতিরও দু'টো দিক আছে, একটা তত্ত্বের দিক আর একটা প্রয়োগের দিক। তত্ত্বের দিকটা যদি গুরুভার হয় এবং তার প্রয়োগের দিকটাও যদি নির্দোষ না হয় তবে সেখানে ছাত্রযুবসমাজও বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। দুঃখের বিষয় এখন ভারতের ভোট-কেন্দ্রিক রাজনীতি ব্যবসায়িক পর্যায়েই নেমে এসেছে। এবং ছাত্রযুবসমাজে এর বিষক্রিয়াও আমরা লক্ষ্য করছি। রাজনীতির আদর্শের দ্বারা নৈতিক চরিত্র-গঠন এখন গৌণ ব্যাপার। যেনতেন-প্রকারেণ ভোটজয় বা ভোটক্রয়ের দ্বারা ক্ষমতার্জন রাজনীতির আদর্শকে কলুষিত করছে।

স্বামীজী কিন্তু আমাদের সুহমান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে ভারতের মাটিকে প্রথমেই রাজনৈতিক ফসল ফলাবার উর্বর ক্ষেত্র মনে করেননি। চেয়েছিলেন—"ভারতে যে-কোন সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হোক, প্রথমত ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে প্লাবিত করো (Before flooding India with socialistic or political ideas, first deluge the land with spiritual ideas)।" কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি দেশকে ধর্মের নামে স্লোগানে কিংবা সংকীর্তনে বা তত্ত্বকথায় মাতাতে চেয়েছিলেন। তিনি যে ধর্মের কথা বলেছিলেন তা হল সুপ্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের ধ্যানধারণার ফসল—বেদান্ত। বিবেকানন্দ-প্রতিভার ও মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভবত এখানেই যে, তিনি বেদান্তের দুরূহ 'আত্মতত্ত্ব' ও 'শক্তিতত্ত্বে'র প্রায়োগিক দিকটাও সাফল্যের সঙ্গে সর্বসাধারণের জন্য উন্মোচিত করেছিলেন। এরই তিনি নাম দিয়েছিলেন 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' বা ব্যবহারিক বেদান্ত। এবং তাতেই তিনি দেখিয়েছিলেন এখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পক্ষে রাজনীতিও কেমনভাবে সহাবস্থান করতে পারে এবং আমার মতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ-কথিত বেদান্তধর্মকে অর্থাৎ

প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তকে স্থান দিলে তার সাংবিধানিক কাঠামোও অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সেইসঙ্গে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ও রাজনীতিগত অনেক জটিল সমস্যারও সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। ক্রমবর্ধমান রাজনীতি, সমাজনীতির জটিলতা এবং সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিও বিবেকানন্দ কথিত এই বেদান্তের আলোতেই পথ খুঁজে পেতে পারে। নিজেই বলেছিলেন—"রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যেসকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলি সমাধান করা যায় না। উক্ত সমস্যাগুলি ক্রমশ বিপুলায়তন হইতেছে, বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র।"

স্বামীজী দেখিয়েছেন, সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন একত্বভাব বা ঐক্য-সাধন করতে পারে বেদান্তের 'এক'-তত্ত্ব বা 'আত্মতত্ত্ব'ই এবং আন্তর্জাতিক সংহতির স্বর্ণ-সিংহাসনটি এই তত্ত্বের ওপরই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এবং এই 'এক'-তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব বা আত্মশক্তিতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকের কাছেও 'চ্যালেঞ্জ'-স্বরূপ উপস্থিত করেছিলেন এই বলে যে—"এখন তোমরা সমগ্র জড়বস্তুকে—সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে, এক বৃহৎ জড়সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়া থাকো। তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য, এমন কি আর যাহা কিছু—সবই এই এই মহান সমুদ্রের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র, আর কিছু নয়। মানসিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা এক অনন্ত চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীত হয়। তুমি আমি সেই চিন্তাসমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত, আর চৈতন্য দৃষ্টিতে দেখিলে সমগ্র জগৎ এক অচল অপরিণামী অখণ্ড সত্তা—অর্থাৎ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়।"

এই অসীম বা অনন্ত 'শক্তিতত্ত্ব' বা 'আত্মতত্ত্বের' প্রায়োগিক দিকটাই বিবেকানন্দ-কথিত 'প্র্যাক্‌টিল্যাল' বেদান্ত। বলেছিলেন, "…আর তুমি যাহা করিতেছ, তোমার পক্ষে তাহাই অতি উত্তম। যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অতি সামান্য কর্মও অদ্ভুত ফল দিয়া থাকে; অতএব যে যতটুকু পারে, করুক। জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইবে; ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল আইনজ্ঞ হইবে। এইভাবে অন্যান্য সর্বত্র।"

আধুনিক সমাজনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি যদি বিবেকানন্দ-কথিত বেদান্তের এই প্রায়োগিক দিকটা গ্রহণ করত এবং সমাজের সবস্তরে তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হত যেমন তিনি বলেছিলেন "বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত

হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা—সে যে কাজই করুক না কেন, সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বাবস্থায় বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক”—তাহলে আমরা অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের হাত থেকে মুক্তি পেতাম এবং সবস্তরে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত না। বেদান্তের ‘একতত্ত্ব’ বা ‘আত্মতত্ত্ব’ কেবল জাতীয় সংহতির নয়, আন্তর্জাতিক সংহতিরও মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই সেই মানসিকতা এখনও গড়ে ওঠেনি। তাই আজ সবক্ষেত্রেই এত অরাজকতা। সাম্প্রদায়িক-কলহ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতির রাহুগ্রাসে পতিত আজ ভারতবর্ষ। এর সমাধানে রাজনীতির সঙ্গে বেদান্তের ‘একতত্ত্ব’ নীতিরও উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা যেত যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে অধিকাংশ নেতারাই অতিমাত্রায় ‘পদ’ ও ‘ক্ষমতা’ লাভের জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধীর মতো দশজন নেতা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম। এবং আগেও বলেছি, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে স্বামীজীর ‘প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত’ নীতিকে গ্রহণ করে এক সর্বাত্মক আন্দোলনের সূচনা করা যায় দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষানীতির সবরকম সমস্যার মোকাবিলায়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পঞ্চাশ বছর আগে স্বামীজী যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন—“দেখতে পাচ্ছি কোন অভাবিত উপায়ে ভারত স্বাধীন হবে, কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের উপযুক্ত করে না তোল, তিন পুরুষের বেশি সে স্বাধীনতা টিকবে না—” স্বাধীনতা-প্রাপ্তির তিন দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে যে ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হচ্ছি আমরা তাতে কি একথাই মনে ওঠে না বারবার যে, এ-যুগের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ কত প্রাসঙ্গিক দেশ ও জাতি গঠনের পক্ষে? স্বাধীনতা রক্ষার ও স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিক হওয়ার সব বিধানই যে তিনি দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য।

জাতীয় ঐক্যরথের সারথি বিবেকানন্দ

সত্যিই ভারতবর্ষ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা! হয়তো সম্প্রতি-আবিষ্কৃত স্নুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটাও এখানে পাওয়া যাবে। ডোলমেনদের অভাব নেই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোন জায়গা খুঁড়লেই মিলবে। হ্রদবাসী বা নদীতীরবাসীরা নিশ্চয়ই কোন সময় এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জাকারী তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও নানা অঞ্চলে দেখা যাবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। এদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূণ, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় থেকে আরম্ভ করে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যারা এখনো একাত্ম হয়ে যায়নি—এইসব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্রে—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিম্নে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করে আবার শান্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষের এই হল ইতিহাস।

"জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসনপ্রণালী এই সমস্ত নিয়েই একটা জাতি গঠিত। যদি একটা একটা করে জাতি নিয়ে আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, অন্যান্য জাতি যেসব উপাদানে তৈরি সেগুলি সংখ্যায় ভারতীয় জাতির চেয়ে অল্প। আর্য, দ্রাবিড়, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয়—পৃথিবীর সব জাতির রক্ত যেন এদেশে আছে। এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ আর আচার-ব্যবহারে দু'টি ভারতীয় শাখাজাতির যে প্রভেদ—ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যেও তত নেই।

"কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি। ঐ ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করতে হবে। ইউরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।"

এমন স্বদেশপ্রেমিক—ভারত-প্রেমিক সন্ন্যাসী আর কেউ নন—ইনি স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

আশ্চর্য এই সন্ন্যাসী! অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েও অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ধারে-কাছে গেলেন না। সর্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমিক সন্ন্যাসী হয়েও

বললেন—"আর কিছু প্রচার করা আমার দায় নয়—আমার দায় শুধু এদেশের [অর্থাৎ ভারতের] লোককে মানুষ করে তোলা।"

আমরা জানি, এ দায়-দায়িত্ব পালন করতে স্বামীজীকে কী পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে—রক্ত-মোক্ষণকারী কী অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তাঁকে অকালে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু দেশমাতৃকার সেবায় তাঁর এই আত্মত্যাগ বিফল হয়নি। আজ যতোই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিবেকানন্দকে কোন সম্প্রদায়ের মাপকাঠিতে মাপা যায় না। তিনি যেন একটি অফুরন্ত শক্তির আধার—যা থেকে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরাই আপন-আপন ছাঁচে নিজেদের ঢেলে দেশমাতৃকার সেবায় লাগতে পারেন। একদিকে বিবেকানন্দ যেমন সর্বজনীন, সর্বকালের, সর্বধর্মের আবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তিনি একান্তভাবেই ভারতপ্রেমিক তথা স্বদেশপ্রেমিক—তাঁর চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা সব কিছুর মূলেই ছিল ভারতবর্ষ, কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়।

স্বামীজী এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারতেরই কল্পনা করতেন, বলতেন—"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই—যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরাণও নেই—অথচ সে-কাজ করতে হবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণকে সমন্বিত করেই।" স্বামীজী স্বপ্ন দেখতেন, এ-দেশের মাটির ওপরে থাকবে, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক মানুষ। বলেছিলেন, "খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না ; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না ; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে।"

তাই তিনি দ্বিধাহীনভাবেই ঘোষণা করেছিলেন—ভারতে সব "সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।" এবং এ-পথের আলোর দিশারি ছিলেন স্বয়ং তিনিই। তিনি বেদান্তকে স্বীকার করেছিলেন এইজন্যই যে, তা সর্বজনীন এক ঐক্যমতেরই ওপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এই বেদান্তের মাঝেই তিনি পেয়েছিলেন 'শক্তিযোগ'—মানুষের দুর্বলতা কাটাবার, ঘুম ভাঙ্গাবার মন্ত্র। সেই একইভাবে স্বামীজী তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এইজন্য যে, তাঁর দর্শন ও মতবাদে তিনি পেয়েছিলেন সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের এক সর্বজনীন মিলনভূমি। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অলৌকিকত্বের চেয়েও তাঁর কাছে এই দিকটাই ছিল বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু তাই বলে একথা ভাবলেও ভুল হবে যে, স্বামীজী ভারতের সনাতন অ্যাধ্যাত্মিকতাকেও বর্জন করতে বলেছিলেন। বরঞ্চ স্বামীজী একথা ভালভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন যে, এই ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিকতাই। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে স্বামীজীর এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শই এদেশে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে না। [ধর্ম-

নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গেও স্বামীজীর এই মতবাদের বিরোধ নেই। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিন্তু মানুষের ধর্মবিমুখতা বোঝায় না। স্মরণীয়, স্বামীজীর উক্তি—"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই – যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরাণও নেই" ইত্যাদি]। আবার স্বামীজী একথাও বারবার বলে ভারতবাসীকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিকতা মানে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা নয়। কোন ধর্ম বা আধ্যাত্মিক-সত্যের মূলেই সাম্প্রদায়িকতা নেই। এবং একথাও তাঁরই—"যদি এই ভারতে, যেখানে চিরদিনই সকল সম্প্রদায়ই সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন, সেই ভারতে এখনো এইসব সাম্প্রদায়িক বিবাদ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বেষহিংসা থাকে, তবে ধিক আমাদিগকে, যাহারা সেই মহিমান্বিত পূর্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়।"

স্বামীজী ভালভাবেই জানতেন যে, সাম্প্রদায়িকতার জন্ম কুসংস্কার থেকেই হয়। মানুষের মন থেকে এই কুসংস্কার দূর করা যেতে পারে কেবল শিক্ষার যাদুমন্ত্রেই। তাই স্বামীজীর প্রথম প্রচেষ্টা ছিল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। [খুবই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, স্বাধীন ভারতে এখনো শিক্ষিতের হার মাত্র ৩০ শতাংশের মতো, এবং নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-কলহের উপ্ত বীজ ছড়িয়ে আছে বাকী বিপুল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই।] কিন্তু যে নবীন শিক্ষার আলোকে স্বামীজী এদেশের মানুষকে কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তা কিন্তু কোনমতেই ভারতে প্রাচীন ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। [আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্বামীজীর আস্থা ছিল না। তাঁর মতে, এ শিক্ষা চরিত্র, আত্মবিকাশ ও স্বদেশ-হিতৈষণার পরিপন্থী। এখানে স্মরণীয়, স্বাধীন ভারতের এক রাষ্ট্রকর্ণধারের উক্তিও—"এ শিক্ষায় দেশপ্রেম জাগে না"—বলেছিলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে।] স্বামীজী দেখেছিলেন যে, ভারতবর্ষ টিকে আছে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের এক শক্ত বনিয়াদের ওপরই। তাই স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণার ফসল যে বেদান্ত, সেই বেদান্তের উদার ও সর্বজনীন নীতিগুলিও বিশেষ স্থান পেয়েছে। দেখিয়েছেন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বেদান্ত কিভাবে উপযোগী ও কার্যকর করা যেতে পারে। এরই নাম তিনি দিয়েছিলেন 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'।

যাই হোক, সেদিনের মতো আজও আমাদের জাতীয় সংহতির এই টলায়মান অবস্থায় স্বামীজীর চিন্তাভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরা উচিত, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের কাছে। স্বাধীন ভারতে আজ বিবেকানন্দের জন্মদিন (১২ জানুয়ারী) জাতীয় 'যুব দিবস' হিসাবে ঘোষিত অর্থাৎ স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের ৮৮ বছর

পরে আজও জাতীয় যুবনেতা। দেশে এমন নেতার আদর্শ তো চিরকালই দরকার যা মানুষের আত্মশক্তি জাগায়, এবং মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখায়। যে নেতৃত্ব ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও কখনোই আকাশের দিকে তাকায়নি। যা সবসময়ই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে দেশের দলিত অবহেলিত মানুষের দিকেই। যে নেতৃত্ব দেশের জন্য আমাদের ভাবতে শেখায়, যে নেতৃত্ব সমাজের কোন ওপরতলার মানুষকে নয়, গরীব, দুঃখী, অজ্ঞ, মুচি-মেথরকে "তোমার রক্ত, তোমার ভাই" বলে চিনতে শেখায়—সেই অতুলনীয় নেতার আদর্শ নিঃসন্দেহে আজ আমাদের চোখের সামনে থাকা দরকার। যদিও তিনি আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন একটি শাশ্বতকালের আদর্শ—সেই আদর্শের পথ ধরে আমরা জাতীয় ঐক্যরথটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এবং এখানে তাঁর সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয়—"আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই—সেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরাণও নেই—অথচ, সে-কাজ করতে হবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণকে সমন্বিত করেই।"

স্বামীজীর ধৈর্য ও সহনশীলতা

স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সাংসারিক বিপর্যয়ে এবং আত্মীয়গণের প্রতারণায় তিনি একান্ত অসহায় হয়ে পড়েছেন। এদিকে দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সঙ্গলাভের ফলে হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। এই অবস্থায় সংসারে স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী মানুষের হৃদয়হীনতায় তিনি অভিমানে নীরব থাকতেন, বরং সমর্থনই জানাতেন যখন তাঁকে নাস্তিক, স্বেচ্ছাচারী ও অধঃপতিত বলে প্রচার করা হত। ফলে নরেন্দ্রনাথের নিন্দায় ও অপবাদে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে তাঁর যত বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি চির-বিশ্বস্ত "নরেন্দ্র"। নরেন্দ্রনাথের কুৎসাকারিগণকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "চুপ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।" এই সময়ের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্রনাথ বলতেন, "একা ঠাকুরই আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস-ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারে অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাবনা-মাত্র করিয়া থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবী বিবেকানন্দরূপী বিশাল বটবৃক্ষের অঙ্কুরোদগম করে গেছেন, বরাহনগর মঠে তা পল্লবিত হতে শুরু হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের ঘরে ঘরে গিয়ে ডেকে আনতে লাগলেন তাঁর এই নতুন সাধন-পীঠে।

নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সকলে একে একে সেখানে এসে জুটলেন। ভূতুড়ে বাড়ী সত্যিই জমজমাট হয়ে উঠল। তবে তা ভূত-প্রেতের নৃত্য-গীতে নয়—অদ্ভুত গুরুর অদ্ভুত শিষ্যদের আধ্যাত্মিকতার ভাব প্লাবনে!

সে-সময় ভারতে বিভিন্ন ধর্মভাবের সংমিশ্রণে যে অদ্ভুত মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার কেন্দ্রস্থল ছিল—কলকাতা। পরবর্তীকালে এই সময়ের এক মনোরম বর্ণনা আমরা স্বামী অদ্ভুতানন্দের (স্বামীজীর গুরুভাই) মুখ থেকে শুনতে পাই—"...ঢাক পিটে কি ধর্মপ্রচার হয়? ধর্ম কি বাইরের জিনিস যে একজন বলতে থাকলেই আর একজন তা নিতে পারবে?...এই দেখুন না! দশ-পনের কি বিশ বছর আগে এই কলকাতা শহরে কেমন ধর্মের ঢেউ উঠেছিল, জানেন

তো! রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাদ্রীর দল (Salvation Army) লেকচার দিতো। সমাজে ব্রাহ্মরা সব বক্তৃতা দিতো। পাড়ায় পাড়ায় হরিসভায় কীর্তন হোত। তখনকার কথা মনে করুন। একদিন কোম্পানীর (বিডন) বাগানে কেশববাবু (কেশবচন্দ্র সেন) বক্তৃতা দিলেন তো তার পরের দিন সেই বাগানে খ্রীষ্টান কালী (Rev. Kali Charan Banerjee) লেকচার দিলেন। লোকে তাঁদের কথা শুনলো। আবার একদিন কৃষ্ণানন্দ স্বামী এলেন, তিনিও বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। লোকে তাও শুনলো। একদল বক্তা হিন্দুধর্মকে গালাগালি দিল, আর একদল সেই ধর্মের সুখ্যাতি করলো।...এত জবরভাবে ধর্মের প্রচার হতে লাগল....।"

এ-হেন পরিস্থিতির মধ্যে এই নবীন সন্ন্যাসিদলের উদ্ভব। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—নিধিরাম সর্দার! কী ব্যাপার! শিক্ষিত ছেলেরা ঘর ছেড়ে, অর্থের নেশা ছেড়ে ভূতুড়ে বাড়ীতে ভূতের মতোই রহস্যজনকভাবে দিন যাপন করছেন।

অবাক লাগে বৈ কি! আরও আশ্চর্য লাগে ঐ ছেলেটিকে নরেন্দ্র! স্বামী অদ্ভুতানন্দ বলতেন -- লিডার! যত বাধা-ঝক্কি আর ঝড়-ঝাপটা এই লিডারকেই সামলাতে হয়। হাসিমুখে সহ্য করেন নিজ আত্মীয়দের আর এইসব গুরুভাইদের পিতামাতার বিদ্রূপ! এ কী মতিভ্রম! সুদর্শন, বুদ্ধিমান, তেজীয়ান যুবক নিজের বংশমর্যাদা ভুলে, পাণ্ডিত্য ভুলে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে! গাছতলা বৈ কি—এই কি মনুষ্যযোগ্য বাসস্থান! গুরুভাইদের পিতা-মাতা নরেন্দ্রনাথকে দোষারোপ করেন আর নিজ নিজ অপত্যস্নেহে অধীর হয়ে চোখের জলে ভাসেন। "এখানে কর্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া! ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।"

এই সময় সর্ববিধ উপেক্ষা ও অবজ্ঞার মধ্যে তাঁরা সঙ্কল্পে কি রকম অটুট ছিলেন তার একটু পরিচয় আমরা পাই স্বামীজীর কথাতেই—"আমাদের বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না।...একবার ভাবিয়া দেখুন, বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল।...বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার ফলে অপরকে (অর্থাৎ আত্মীয়বর্গকে) কত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতিই বা কে সহানুভূতি জানাইবে?..."

আদর্শবান পুরুষের বাধা যত প্রবল হয়, আদর্শের উপর তাঁর নিষ্ঠা ততই প্রবলতর হয়। পরবর্তীকালে এই আদর্শ-নিষ্ঠার কথায় স্বামীজী বলেছেন, "কি জানিস্ বাবা, সংসার সবই দুনিয়াদারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে, চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি লিখছে, ওসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনও মহৎ কার্য করা যায় না। এই শ্লোকটা, জানিস্ না?—

'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেচ্ছম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু শতাব্দান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥'

—লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা যুগান্তে তোর দেহপাত হোক, যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট হোস্‌নি। কত বড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌছান যায়। যে যত বড় হয়েছে, তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে, তার জীবন ঘসেমেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে।"

পরিব্রাজক জীবনেও তাঁকে এই ধৈর্যরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্ববিধ দ্বন্দ্বে তিনি অবিচলিত ছিলেন গীতোক্ত যোগীর মতো :

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥

স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন তাঁর এই মানসিক স্থৈর্যেরই নিদর্শন : "পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবন-সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানস-সায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি। মরুভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দাবাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের উপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ উদ্বেল হয়ে ওঠেননি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি। দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্রধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকবসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই।" (স্বামী নির্বেদানন্দ, উদ্বোধন)

যে বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যা এতদিন আগ্নেয়গিরির মতোই সুপ্তাবস্থায় ছিল, তার যথার্থ স্ফুরণ হয়েছিল পাশ্চাত্ত্যদেশে, বিশেষতঃ আমেরিকায়। সেই বিরাট মনীষার কাছে পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও স্তব্ধবাক হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ ঝঞ্ঝার মতো এসেই তা তাঁদের হৃদয়কে তোলপাড় করেছিল।

কিন্তু তাঁর এই বিজয়-পথ কুসুমাকীর্ণ ছিল না। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারি-গণের অপপ্রচার আর একদিকে তাঁর স্বদেশবাসী ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের ঈর্ষা-

দ্বেষের শাণিত শর। "...যাহা হউক আমি আমেরিকায় যাইলাম। টাকা আমার নিকট অতি অল্প ছিল—আর ধর্মমহাসভা বসিবার পূর্বেই সমুদয় খরচ হইয়া গেল। এদিকে শীত আসিল। আমার কেবল পাতলা গ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্র ছিল। একদিন আমার হাত হিমে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এই ঘোরতর শীতপ্রধান দেশে আমি যে কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ যদি আমি রাস্তায় বাহির হই, তাহার ফল এই হইবে যে, আমাকে জেলে পাঠাইয়া দিবে। তখন আমার নিকট শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। আমি মাদ্রাজস্থ কয়েকটি বন্ধুর নিকট তার করিলাম। থিওজফিস্টরা এই ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন, 'শয়তানটা শীঘ্র মরিবে—ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।'...আমি এখন এসব কথা বলিতাম না, কিন্তু হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা জোর করিয়া ইহা বাহির করিলেন। আমি তিন বৎসর এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। নীরবতাই আমার মূলমন্ত্র ছিল..."

"তাহার পর তাঁহারা অপর বিরুদ্ধ পক্ষ খ্রীষ্টান মিশনারিদের সহিত যোগদান করিলেন। এই শেষোক্তেরা আমার বিরুদ্ধে একরূপ ভয়ানক মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারা যায় না। তাহারা আমাকে প্রত্যেক বাড়ী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং যে কেহ আমার বন্ধু হইল, তাহাকেই আমার শত্রু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা আমেরিকাবাসী সকলকে আমাকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং অনশনে মারিয়া ফেলিতে বলিতে লাগিল; আর আমার বলিতে লজ্জাবোধ হইতেছে যে, আমার একজন স্বদেশবাসী ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন—আর তিনি ভারতের সংস্কারকদলের একজন নেতা।...আমি ইঁহাকে অতি বাল্যকাল হইতেই জানিতাম, তিনি আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। অনেক বর্ষ যাবৎ আমার সহিত স্বদেশবাসীর সাক্ষাৎ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল, আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম! যেদিন ধর্মমহাসভায় আমি প্রশংসা পাইলাম, যেদিন চিকাগোয় আমি লোকপ্রিয় হইলাম, সেইদিন হইতে তাঁহার সুর বদলাইয়া গেল এবং তিনি প্রকাশ্যেই আমার অনিষ্টাচরণ করিতে, আমাকে অনশনে মারিয়া ফেলিতে, আমেরিকা হইতে লাথি মারিয়া তাড়াইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।"

পাশ্চাত্ত্যদেশে যারা স্বামীজীর অপাপবিদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, সেইসব চক্রান্তকারী ও কুৎসাকারীর বিরুদ্ধে তিনি কোন দিন একটিও অভিশাপ-বাক্য উচ্চারণ করেননি এবং অন্য কাউকেও এসবের প্রতিবিধান করতে বলেননি। নীরবে তিনি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। এই সময় স্বামীজী যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার অনেক বিবরণ মেরী লুই বার্ক-প্রণীত 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখিকা স্বামীজীর তিতিক্ষা ও পবিত্রতারূপ চরিত্র-মাধুর্যে অভিভূত হয়ে গভীর বিস্ময়ে লিখেছেন, "Thus, during a period of

outward trial and tribulation, Swamiji's inner mind and heart were filled only with spiritual joy and love. Inscrutable indeed are the ways of God and God-men !" (p. 413).

স্বামীজী চরিত্রের এই যে আর একটি রূপ, যা ধৈর্য, সহনশীলতা ও পবিত্রতার সৌরভে সুরভিত, তা আলোচনা করতে গিয়ে স্বতই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে—এর মূল কোথায় ? কোন্ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি সব রকম সংঘাতকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন ? স্বামীজী নিজেই এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন একটি চিঠিতে—"মানুষের কথা আমি কি গ্রাহ্য করি ? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিনত না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত খোকা ! ওরা আর এর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে ? কি ! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব ? · "

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ

"সাগরগামিনী বিশালকায়া নদী যেমন বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিপুল ভূভাগকে শস্যশালী ও অসংখ্য জীবকে জলদানে তৃপ্ত করে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও সেইরূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজন সাধন ও ত্রিতাপদগ্ধ মানবের শান্তিবিধান করিয়াছেন। অন্য কথায়, ঠাকুর ছিলেন যেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক বিদ্যুতাধার, আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেন ঐ অমিত তেজের সঞ্চরণের উপযোগী তারসমূহ। * * * ইঁহাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস, ত্যাগ-তপস্যা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ভ্রাতৃপ্রেম এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি দেবদুর্লভ গুণরাজি সকলেরই জীবনে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা)

বাস্তবিকই একজন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে এবম্বিধ গুণাবলীর সমন্বয় জগতের অন্যান্য সন্ন্যাসী-সংঘে প্রায় বিরল-দৃষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা তাঁর গুরুভ্রাতাগণের পুরোভাগে ছিলেন। কিন্তু তাঁর জগৎ-জোড়া সাফল্য, দেশ-বিদেশের সম্মান তাঁকে কোনোদিন কিছুমাত্র অহমিকার বশীভূত করেনি বা তাঁর গুরুভ্রাতাগণের স্নেহ-প্রীতির বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে নেয় নি। গুরুভ্রাতাগণের উপর তাঁর কী অগাধ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর 'পত্রাবলীর' বহু জায়গায় উল্লেখ আছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তিনি চিকাগো থেকে জুনাগড়ের দেওয়ানজীকে লিখছেন, "প্রাচীন ধর্ম শুধু নূতন কেন্দ্র সহায়েই নূতনভাবে সঞ্জীবিত হইতে পারে। * * * সেই মহা আন্দোলনের সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় কি? ঐ তরঙ্গের আগমনসূচক মৃদু গুঞ্জরণ শুনিতে পাইতেছেন কি? সেই শক্তিকেন্দ্র, সেই দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি সেই মহান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুবকদল ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। উহারাই এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিবে।" তিনি জানতেন যে, তাঁর প্রত্যেক গুরুভ্রাতাই এক-একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে জগতের কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন উৎসাহ ও পরস্পরের সহযোগিতা।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলতেন, দয়া আর ভালবাসায় জগৎ জয় করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সূত্রপাত বরাহনগর মঠে দেখা যায় কী এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতিতে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের নিশিদিন বেঁধে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সে এক অদ্ভুত সময়! সংঘের কোনো স্থিতাবস্থা নেই। একটি পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ীতে স্বামীজীর প্রচেষ্টায় ও শ্রীরামকৃষ্ণের দু'একজন গৃহী শিষ্যের অর্থানুকূল্যে কোনরকমে একটি মঠ স্থাপিত হয়েছে। স্বামীজীর তখন কতই বা বয়স! সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু তিনি এক প্রচণ্ড উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে কাজের ভার তাঁর উপর অর্পণ

করে গেছেন তা যে তাঁকে সম্পন্ন করতেই হবে। তাই ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি গৃহ-প্রত্যাগত ঠাকুরের অন্তরঙ্গ যুবক-শিষ্যগণকে মঠে আহ্বান করতে লাগলেন। স্নেহ-মিশ্রিত তিরস্কারে তাঁদের বলতেন, "তিনি (ঠাকুর) যে তোদের এত ভালবাসতেন তা কি সংসার করবার জন্য ?" এ-দিকে স্বামীজী নিজে তখন সাংসারিক বিপর্যয়ে ম্রিয়মাণ। পিতৃ-বিয়োগের পর হৃদয়হীন আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতায় স্বামীজী তাঁর মা আর ভাইবোনেদের নিয়ে একান্ত অসহায়, নিঃসম্বল। গৃহে তিনি আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা করছেন আর মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে গিয়ে গুরুভাইদের সাধন-ভজনে উৎসাহিত করছেন। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের সেই সময় কী গভীরভাবে ভালবাসতেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা কথামৃতে পাই—"নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন (স্বামী ত্রিগুণা-তীতানন্দ) কয় দিন সাধন করিতেছিলেন। * * নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন।" স্বামীজী গুরুভাইটির জন্য খুব চিন্তিত হলেন এবং স্নেহ-করুণ অনুযোগ করতে লাগলেন, "রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আসুক, একবার বোক্‌বো ! কেন তারে যেতে দিলে ?" কিছুদিন পরেই আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ মিটে গেলে তিনি সংসার ত্যাগ করে বরাহনগর মঠে চলে এলেন। স্বামীজীর আগমনে মঠ জমে উঠল। যে কয়জন গুরুভাই তখনও মঠে যোগদান করেন নি, তাঁরাও স্বামীজীর আকর্ষণে এবার একে একে মঠে আসতে লাগলেন।

পরমপুরুষ গুরুদেবের প্রতিকৃতির সামনে নিলেন তাঁরা সন্ন্যাসধর্ম। শুরু হল তাঁদের কঠোর তপস্যা আর গুরুদেবের মহিমা কীর্তন।

স্বামীজীর স্নেহ-প্রীতির বন্ধন থেকে গুরুভাইদের মঠ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার উপায় ছিল না। স্বামীজী সংগীতে কীর্তনে আর শাস্ত্রালোচনায় নিশিদিন তাঁর গুরুভাইদের আনন্দ-বিভোর করে রাখতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সংঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামীজী—এই দুই গুরুভ্রাতার মধ্যে এক অলৌকিক সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। গুরুভ্রাতাগণ তাঁকে 'রাখাল', 'রাজা' বা 'মহারাজ' নামে ডাকতেন। তবে তিনি ভক্তমণ্ডলীর কাছে 'রাজা-মহারাজ' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে অভিহিত করতেন 'অখণ্ডের ঘররূপে' আর ব্রহ্মানন্দকে 'ব্রজের রাখালরূপে'। স্বামীজী ঠাকুরের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে ব্রহ্মানন্দের একটা রাজ্য চালাবার শক্তি আছে। তাই স্বামীজী বলতেন, 'ব্রহ্মানন্দ আমাদের নেতা।' স্নেহ-বিহ্বল স্বামীজী একদিন হঠাৎ রাজা-মহারাজকে প্রণাম করে বলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু', রাজা-মহারাজও কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।' এই দিব্য প্রেমবন্ধন জগতের ইতিহাসে বিরল। স্বামীজী জানতেন যে, রাজা-মহারাজ তাঁর বিরাট ভাবধারাকে কর্মে পরিণত করবার যোগ্য অধিকারী। তাই দেখি,

স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে রাজা-মহারাজকে যে সব পত্র লিখেছেন, তার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক পত্রেই স্বামীজীর ভাবী কর্মধারার বিষয়গুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা। আর হয়েছিলও তাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী মঠ ও মিশনের সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। সানন্দে এই পদে অধিষ্ঠিত করলেন রাজা-মহারাজকে। দীর্ঘদিন ধর্মপ্রচারের ফলে তিনি যা-কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তা রাজা-মহারাজের হাতে তুলে দিলেন। রাজা মহারাজের হাতে এই বিরাট দায়িত্ব সমর্পণ করে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই স্বামীজী তাঁর এই মনোভাব প্যারিস থেকে এক পত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দকে জানিয়েছিলেন—"এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, ব্যস্। গুরু মহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি। * * * গঙ্গাধর ও তুমি, কালী, শশী, * * * এদের ঠেলে ঐ রাখাল আর বাবুরামকে কর্ত্তা করে দিচ্ছি।"

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সব গুরুভ্রাতা সমানভাবে তাঁর ভাব-ধারাকে সমর্থন করতে পারছেন না। তবু তিনি জানতেন যে, তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের নৈষ্ঠিক জীবনের সঙ্গে তাঁর কর্ম ও সেবাব্রতের আপাত সংঘাত থাকলেও তাঁর গুরুভাইগণ নিজ চরিত্রের মহত্ত্বগুণে ক্রমে ক্রমে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, সন্ন্যাস-জীবনের সার্থক প্রকাশ 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের মধ্যেই। গুরুভাইদের সুপ্ত শক্তিকে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করবার জন্য স্বামীজীর সে কী অফুরন্ত উচ্ছ্বাস,—"তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে * * * যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং ন পুং ব্রহ্ম ক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। * * * The only way of getting our divine nature manifested is by helping others to do the same * * * 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি? যারা এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে?"

তবু হয়তো কোনো গুরুভাইয়ের মন সহজে স্বামীজীর কথায় সায় দেয় না। স্বামী যোগানন্দ একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তর দেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" যোগানন্দ আর কোনো আপত্তি করলেন না। গুরুভাইয়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাই দেখি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে যে অভ্যর্থনা করা হয়, যোগানন্দ তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। গুরুভাইয়ের বিজয়গর্বে তিনি একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, "নরেন নর-ঋষির অবতার। নরেনের মধ্যে ঋষির

বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে।"

এদিকে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের সেবাব্রতের ক্রমোন্নতি দেখে বিদেশ থেকে জানাচ্ছেন তাঁর প্রাণমাতানো উৎসাহ,—"নির্ভয়ে কাজ করে যাও—ওয়াহ্ বাহাদুর !!

সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্ !! * * আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষার জন্য।" চিঠিটি স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা। আমরা জানি গুরুভাইদের মধ্যে অখণ্ডানন্দই সর্বপ্রথম স্বামীজীর সেবাধর্মের কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করেন। স্বামীজী জানতেন যে, নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে মানুষের মন তার কৃতকর্মের শুভাশুভ বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে। অখণ্ডানন্দকেও এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজে নামতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনোদিন নিরুৎসাহে ভেঙ্গে পড়েন নি। কারণ বিদেশ থেকে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ তাঁর আবেগময়ী ভাষায় চিঠি দিয়ে অখণ্ডানন্দকে স্বকার্যে প্রেরণা দিয়েছেন। গুরুভাইয়ের একটু সেবাকার্যে স্বামীজীর সে কী আনন্দ আর উল্লাস—"* * * ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি ? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম, কর্ম,, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গ্তে হেঁ—কর্ম কর্ম, কর্ম, even upto death (মৃত্যু পর্যন্ত)। * * * এই তো পূজো, নরনারী—শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না ? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য !"

অখণ্ডানন্দ নবোদ্যমে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর কোনো যুক্তি-তর্কের অবকাশ নেই। স্বামীজীর কাজের জন্য তিনি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কারণ তিনি যে স্বামীজীকে সত্যিই ভালবাসতেন। 'কথামৃতে' উল্লেখ আছে, বরাহনগর-মঠে স্বামীজী না থাকলে তিনিও থাকতে পারতেন না। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী একবার মীরাট প্রদেশে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে কয়েক মাস অবস্থান করার পর স্বামীজী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে বললেন, "তুমি যদি পাতালেও যাও, আর সেখান থেকে তোমায় খুঁজে বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাধর নয়।" এই গুরুভ্রাতৃপ্রেম অতুলনীয় ! স্বামীজী নিজেও জানতেন সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় গুরুভাইরা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। তা না হলে তিনি যে বিপুল উদ্যম নিয়ে নরনারায়ণের সেবা ও শিক্ষার কাজে নেমেছিলেন, সে কাজে হয়তো এত সহজে সাফল্য লাভ করতে পারতেন না। গুরুভাইদের সঙ্গে একটু বচসা হলেই তিনি অতিশয় মনোকষ্ট অনুভব করতেন। একবার বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে একটি সামান্য ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দের একটু বচসা হয়। তাতে স্বামীজী নিজেকে কতই না অপরাধী মনে করে বলেন, "রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর।" গুরুভাইয়ের এরকম আতিতে

ব্রহ্মানন্দও বিচলিত হন। যেমন করে শিশুকে সান্ত্বনা দেয়, তিনি সেইরকম স্বামীজীকে বোঝাতে লাগলেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগালি দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।"

কী প্রচণ্ড কর্মশক্তি, কী মহৎ-প্রাণ নিয়ে স্বামীজী জন্মেছিলেন, অথচ গুরু-ভাইদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল একেবারে শিশুর মত! স্বামীজীর যখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য দেশে যাওয়া স্থির হল, তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রবল বৈরাগ্যবান হরি মহারাজ পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে রাজী হলেন না। স্বামীজী বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে, হরি মহারাজ তাঁর কাজে সহায়তা করবেন। তিনি চিঠিতে লিখে-ছিলেন, "হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি তখনই নূতন বল পাই।" চির-শিশু স্বামীজী গুরুভাইয়ের পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে অনিচ্ছা দেখে আর্ত-স্বরে বললেন, "হরি ভাই, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমায় এ কাজে সাহায্য করবে না—কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?" দিগ্বিজয়ী গুরুভাইয়ের এই আর্তিতে হরি মহারাজ মুগ্ধ হলেন, রাজী হলেন স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে। সেখানে তিনি এমন সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত প্রচার করেন যে, স্বামীজী তাতে উৎসাহিত হয়ে বলেন, "আমি পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ক্ষাত্রবীর্য দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি, তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যান-পরায়ণতা দেখাও।" নিউইয়র্ক কেন্দ্রের কার্যভার হরি মহারাজের উপর ন্যস্ত করার অনেকদিন আগেই একবার স্বামীজী তথাকার ভক্তমণ্ডলীকে বলেছিলেন, "আমি তো তোমাদের কাছে শুধু বক্তৃতা করেছি; এরপর তোমাদের কাছে আমি আমার এমন একজন গুরুভাই পাঠাব, যার মধ্যে কি করে আমার বাক্যগুলি জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে।"

এবারে এগিয়ে এলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বা শশী মহারাজ। পূজা-অর্চনায় সাধন-ভজনে যিনি আপনভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, তিনিও স্বামীজীর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না। এতদিনের একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা তিনি যে দৈব-শক্তি অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে তিনি এবার এগিয়ে এলেন নরনারায়ণের সেবায়। এ শক্তি জ্ঞান ও সেবার, প্রেম আর পবিত্রতার। কী সুন্দরভাবে স্বামীজী তাঁকে দেশমাতৃকার সেবায় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন—"গোটাকতক ক্যামেরা কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। * * * তারপর কতকগুলো গরীবগুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography প্রভৃতির ছবি দেখাও * * * কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যে, ঘরে দিন দুপুরে। কত গরীব মূর্খ * * আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁথি পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও।" স্বামীজীর আহ্বানে রামকৃষ্ণা-

নন্দ মাদ্রাজে এলেন। নিজের চরিত্র মহিমায় তিনি সেখানে অল্পদিনেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং স্বামীজীর নির্দেশিত-পথে গণজাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এতে মাঝে মাঝে এসে দেখা দেয় প্রবল বাধা-বিপত্তি, গ্লানি আর বিরক্তি। শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী-জীবনে বড়ই সংঘাত উপস্থিত হয়। কিন্তু নিরভিমানী সন্ন্যাসীর মনের ক্ষুব্ধ-বেদনা কে বুঝবে? এরূপ অবস্থায় তিনি স্বামীজীর ছবির দিকে তাকিয়ে সক্রোধে বলেন, "তুমিই তো আমায় এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ।" পরক্ষণেই আবার স্বামীজীর প্রতিকৃতিকে প্রণাম করে নিজের এই অভিমানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামকৃষ্ণানন্দেব এই চরিত্র-মহিমা স্বামীজী একবার নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন, "তাঁহার (রামকৃষ্ণানন্দের) দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ।"

স্বামীজী কোনো গুরুভ্রাতার নিজস্ব ভাব নষ্ট করতে চাইতেন না। স্বামী অভেদানন্দ স্বভাবতঃই কৃচ্ছ্রতাপরায়ণ এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। বরাহনগরমঠে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশুনায় মগ্ন থাকতেন। আর অবসর মত স্বামীজীর সঙ্গে নানা শাস্ত্র আলোচনা করতেন। সেই জন্য তিনি মঠের দৈনন্দিন কার্যে বিশেষ যোগ দিতে পারতেন না। এতে কোনো গুরুভাই অসন্তোষ প্রকাশ করলে স্বামীজী তাদের বোঝাতেন এবং অভেদানন্দকে পড়াশুনোয় উৎসাহ দিতেন। স্বামীজী সবসময়েই বলতেন, সংঘে বিদ্যাচর্চা খুব দরকার। অভেদানন্দও স্বামীজীকে মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। তাই দেখি আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্য-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকেরা স্বামীজীর অপযশ গাইতে লাগল, তখন অভেদানন্দ বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি এর প্রতিকারের জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। বিদেশে স্বামীজীর কার্যের সমর্থন করার জন্য ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার টাউন হলে যে বিরাট সভার আয়োজন হয় তা সুসম্পন্ন করবার জন্য অভেদানন্দ প্রচণ্ড উদ্যমে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'ভক্তমালিকা'য় উল্লেখ আছে, "কালী বেদান্তী (অভেদানন্দ) এই সময় প্রাণপণ খাটিয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন।"

এই সুমহান্ গুরুভ্রাতৃপ্রেমের উপরই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ আজ দৃঢ় প্রতিষ্ঠ। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এবং উপাসনার সঙ্গে নরনারায়ণ সেবার এরূপ সংগমস্থল সত্যই বিরল। মুষ্টিমেয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দল সেদিন ভারতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য আত্মোৎসর্গ করে যে মহান আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন, আজ তা বিরাট মহীরুহে পরিণত। এই লোকোত্তর পুরুষদের চরিত্রবিশ্লেষণ সহজসাধ্য নয়। আমরা কেবল তা অনুধ্যান করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামী মাধবানন্দ যথার্থই লিখেছেন, "ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবৈভব ও গুণ গরিমায় সকলের শীর্ষস্থানীয় নরেন্দ্রনাথ বা জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দও যেমন ছিলেন, তেমনি আবার আভিজাত্যের সম্পর্কশূন্য নিরক্ষর লাটু মহারাজ

বা স্বামী অদ্ভুতানন্দও ছিলেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহরূপে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তাধারায় একটি ওলটপালট আনিয়া দিয়াছেন— যাহার পূর্ণবিকাশ হইতে এখনও অনেক দেরি, আর লাটু মহারাজ তাঁহার ঈশ্বরীয়ভাব-বিভোর জীবন ও গ্রাম্য কথাবার্তা দ্বারা, সংখ্যায় তেমন বেশী না হইলেও, যাঁহারাই শান্তিলাভের আশায় তাঁহার নিকট গিয়াছেন, তাঁহাদেরই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। * * * শ্রীরামকৃষ্ণ গগনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে বড় ছোট বিচার করা আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত; আমাদের নিকট সকলেই অতি মহান, সকলেই আদর্শস্থানীয়।"

স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' ও টলস্টয়

বিবেকানন্দ-প্রতিভা পাশ্চাত্যের মনীষী—চিন্তাবিদ্‌দের কাছে ছিল এক মহাবিস্ময়—যেন বিস্ময়ের সমুদ্র। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রতিভা-সমুদ্র থেকে কত রত্নই না উঠেছে পাশ্চাত্য দেশে। মানব সভ্যতার যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ—আধ্যাত্মিকতা। তাই তিনি সে সময় অকাতরে বিলিয়েছেন। আমরা এও জানি, পাশ্চাত্য জনমানসে তিনি সে সময় হয়ে উঠেছিলেন 'Cyclonic Hindu' কেবল আধ্যাত্মিকতায় নয়, তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারাও তিনি পাশ্চাত্যভূমিতে, বিশেষত আমেরিকায় ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের কথা। শিকাগোর বিশ্বধর্ম-মহাসভায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয়পত্রে লিখেছিলেন—ইনি এমন একজন জ্ঞানী মানুষ, যাঁর জ্ঞান আমাদের সব অধ্যাপকের জ্ঞান একত্রিত হলেও তার সমান হবে না।

একদিকে যেমন স্বামীজীর পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাই অজ্ঞাত ছিল না, আবার অধ্যাত্ম-রাজ্যের জ্ঞান, কর্ম, যোগ এবং ভক্তিমার্গেরও তিনি ছিলেন পথ-প্রদর্শক। বিশেষত 'রাজযোগের' বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তিনি সে সময় হয়ে উঠেছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর পাশ্চাত্য অনুরাগীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে ঘরোয়া পরিবেশে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—যাকে বলা হয়েছিলো—"Six Lessons on Raja Yoga"—যে বক্তৃতাগুলি টুকে নিয়েছিলেন তাঁরই পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যারা অনেকটা শ্রুতি-লিখনের মতো করে (যা অবশ্যই তাঁদের নিজেদের অধ্যাত্মচর্চার সুবিধার জন্য)। কিন্তু তাই যখন বিভিন্ন হাত ঘুরে এসে মুদ্রিত হল, তাতেই আবার প্রমাণিত হল কালজয়ী বিবেকানন্দ-চিন্তা ও প্রতিভার এক বিশেষ দিক। প্রমাণিত হল—"Raja Yoga was a science—as much a science as any in the world." (Swami Vivekananda: His second visit to the West by Marie Luise Burke, দ্রষ্টব্য)।

সেই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের মনীষী ও চিন্তাবিদ্‌দের কাছে অধ্যাত্ম জগতের যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। ভাবতে অবাক লাগে, পাশ্চাত্যের বলিষ্ঠ সমালোচকদের দৃষ্টিতে যিনি ছিলেন সে সময় সাহিত্য-প্রতিভায় "ইউরোপের সর্ববৃহৎ শক্তি"—সেই ঋষি টলস্টয়ও এই বই পড়েই স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

স্বামীজীর 'রাজযোগ' বইটি পড়ে অভিভূত টলস্টয় মনের আবেগ প্রথমেই প্রকাশ করলেন একটি চিঠিতে। চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁরই এক অনুরাগীকে—যিনি টলস্টয়কে স্বামীজীর 'রাজযোগ' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন—

Dear Sir,

I received your letter and the book (Raja Yoga) and thank you very much for both.

The book is most remarkable and I have received much instruction from it.

So far humanity has frequently gone backwards from this true and lofty and clear conception of the principle of life but never surpassed it.

Yours etc.
Leo Tolstoy

টলস্টয়ের বিবেকানন্দ অনুধ্যান এইভাবেই শুরু। দু'জনের কোনদিনই দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু টলস্টয় বোধহয় দেখেছিলেন বিবেকানন্দকে—বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিকে সেই বইয়ের মধ্যেই। রোমা রোঁলার মতে—১৮৮৬-১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে টলস্টয় স্বামীজীর রাজযোগ পড়েন। এবং তারপর ক্রমশ স্বামীজীর আরও কিছু রচনা তাঁর হস্তগত হয়—যার বেশির ভাগই হল স্বামীজীর ইউরোপ আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা। সে সব পড়ার পরেই স্বামীজী হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে 'বরেণ্য ব্যক্তি'—যাঁর চিন্তাধারা 'মানুষের মনের দিগন্তকে অবারিত ও প্রসারিত করে আর সেই সঙ্গেই স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁকে টলস্টয়ের মনে হয়েছিল—'মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন জনগণের মানুষ।'

টলস্টয়-অনুরাগী আলেকজাণ্ডার সিফম্যানের মতে—"ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে টলস্টয় প্রাচীনকালের শঙ্করাচার্য এবং আধুনিককালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করেন। তাঁদের) দার্শনিক চিন্তাধারার বিশদ পর্যালোচনাও করেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। একথা জেনে টলস্টয়ের খুব ভালো লেগেছিল যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জনগণেরই একজন। জনগণের মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটা টলস্টয়কে মুগ্ধ করে।

"টলস্টয়ের বিবেকানন্দ-অনুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। ঐ সময়ে তাঁর রোজনামচার এক স্থানে তিনি মন্তব্য লেখেন—ভারতীয় প্রজার একখানা চমৎকার বই তিনি পড়েছেন। বইখানি হচ্ছে ১৮৯৫-৯৬ সালের শীতকালে নিউইয়র্কে বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা।

"ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে ঐ ভারতীয় দার্শনিকের [বিবেকান্দের] বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত সম্পর্কে তাঁর সুন্দর

উক্তির মধ্যে টলস্টয় প্রাচীন ভারতের মনীষীদের বিশেষ করে বেদের বহুতর ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন দেখতে পান। এইসব চিন্তাধারার সঙ্গে টলস্টয় নিজেরও চিন্তাভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করেন।

"বিবেকানন্দের দ্বিতীয় যে বইখানি টলস্টয় পড়েন তার নাম—Speeches and Articles (ইংরেজি ভাষায়)। ১৯০৭ সালে এই সংকলন গ্রন্থখানি টলস্টয় প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন—এই ধরনের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের মনের দিগন্ত আরও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয়।

"১৯০৮ সালে আই নাঝিভিন Voices of the people নামে একখানি প্রবন্ধ সংকলন করেন। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দু'টি প্রবন্ধ 'Hymn of the people এবং God and Man. শেষোক্ত প্রবন্ধটি টলস্টয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বন্ধু নাঝিভিনকে তিনি চিঠি লিখে জানান—'এই লেখাটি অদ্ভুত, অপূর্ব!' এই ভারতীয় দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের প্রতি টলস্টয় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপ, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকলাপের সংবাদ তিনি আগ্রহে পাঠ করতেন।

"১৯০৯ সালের মার্চ মাসে জনগণের পড়ার জন্য নতুন বইয়ের এক তালিকা তৈরি করতে গিয়ে টলস্টয় পোস্রেদ্নিক-সংস্করণের ঐ পরিকল্পনায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উক্তি' নামক বইখানি অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ এন এইনগণকে লেখা এক চিঠিতে জানান: 'বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর রচনাবলীর একখানা সংকলন বার করবার আয়োজন করছি।' ['গ্রন্থজগৎ' পত্রিকা, ১৯৬০]।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রোমাঁ রোঁলার কথা। তিনি একবার দিলীপকুমার রায়ের (স্বনামধন্য ডি. এল. রায়ের পুত্র) কাছে টলস্টয়ের বিবেকানন্দ-প্রীতির কথা উল্লেখ করে বলেন—"তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে দিলীপ, টলস্টয় তাঁর শেষজীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল বিরুকফ, আরো অনেক সাহিত্যিক এখনো বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ করে রুশদেশে এমন অনেক লোক আছেন।" (শ্রীরায়ের "তীর্থঙ্কর" পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

দেখাসাক্ষাৎ না হয়েও টলস্টয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই যে আত্মিক যোগ, এ বোধহয় একদা কাউন্ট (Count) টলস্টয়ের ঋষিত্বে উত্তরণেরই সার্থক দিকদর্শন—যে পথে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিও বিচিত্র পথ ধরে এগিয়েছে। লক্ষণীয় যে, যে অভিজ্ঞতা ও যুগযন্ত্রণার মধ্যে টলস্টয়ের বিশাল সাহিত্যকীর্তি, তা কিন্তু তাঁকে এরপর থেকে হতাশাবাদী করেনি এবং এও কম বিস্ময়ের কথা নয় যে, একদা যে টলস্টয় বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা-ভাসান দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন-যাপন করেছিলেন, "ঋষিত্ব" লাভ করে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে তিনি

দেখালেন বাঁচার পথ। ভাবতে অবাক লাগে এই ঋষিই (যাঁর ধ্যানধারণার ফসল—War and Peace, Anna Karranina, Resurrection প্রভৃতি) একসময় ছিলেন কী সেই ব্যক্তি যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ হত্যা করেছেন, তাসের জুয়ায় গো-হারান হেরেছেন, মানুষকে খুন করার জন্য কখনো কখনো দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছেন, কৃষকদের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন তাদের আর একই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন। এসব তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি, অবশ্য সে অন্য প্রসঙ্গ।

আত্মিক ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মধ্যে ঋষি টলস্টয় যা পেয়েছিলেন তা অবশ্য অনুভূতির ব্যাপার। কিন্তু জীবনসায়াহ্নে রচিত তাঁর অমর সাহিত্যসৃষ্টি 'Resurrection' পড়ে মনে হয়, স্বামীজী সে সময় তাঁর 'রাজযোগ' বইটিতে আত্মশুদ্ধির যে হোমাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন, তারই উত্তাপ যেন এসে লেগেছিল টলস্টয়সৃষ্ট কাউন্ট নেখল্যুদভের চরিত্রেও—যে নায়ক তাঁর চারিত্রিক স্খলনের পর আত্মশুদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। যে সময় (১৯০০ খ্রীঃ টলস্টয়ের এই উপন্যাস প্রকাশিত হয় স্বামীজীও ঐ সময়ে ইউরোপে। তিনি সাগ্রহে টলস্টয়ের এই উপন্যাসটি পাঠ করেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন জনৈক খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে। উক্ত ধর্মযাজকের নাম মঁসিয়ে পল হায়াসিন্থ লয়সন। টলস্টয় প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দিক থেকে এ এক মহামূল্যবান সংবাদও। এবং এই হয়ত শেষ সংবাদ, তবে একে সংবাদ না বলে টলস্টয়-বিবেকানন্দের শেষ ভাব-মিলনও বলা চলে। কারণ এর মাত্র দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে স্বামীজী ও গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধীর কথা দিয়েই শুরু করি—

"বর্ণের অর্থ হল মানুষের উপজীবিকা নির্বাচন ব্যাপারে পূর্ব ব্যবস্থা। বর্ণের বিধান অনুযায়ী মানুষকে জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে তার পূর্বপুরুষের উপজীবিকার অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং এক দিক থেকে দেখতে গেলে বর্ণ ব্যবস্থা হল উত্তরাধিকার তত্ত্ব। বর্ণ-ব্যবস্থা হিন্দুদের ঘাড়ে উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন ব্যবস্থা নয়। হিন্দুদের শুভাশুভের ব্যাপারে যাঁরা অছি ছিলেন, তাঁরা এই বিধান হিন্দুদের জন্য আবিষ্কার করেন। এ প্রথা মানুষের আবিষ্কার নয়। এ হল অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধান—নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মত সতত ক্রিয়াশীল ও সদা জাগ্রত এক তত্ত্ব। আবিষ্কার করার পূর্বেও যেমন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অস্তিত্ব ছিল, বর্ণ-ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দুদের কপালে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি লেখা ছিল। প্রকৃতির কোন কোন বিধান আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমের লোকেরা অতি সহজে নিজেদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে হিন্দুরা এই অপ্রতিরোধ্য সামাজিক প্রবণতা আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন এক সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, বিশ্বে যার তুলনা নেই।

"বর্ণের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার কোন সম্বন্ধ নেই। যে জাতিভেদ প্রথা বর্ণ ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে বিরাজিত, তার ধ্বংস হোক। বর্ণ-ব্যবস্থার এই বিকৃতি হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ। আমাদের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রের বিনষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল এই বর্ণ ধর্মানুযায়ী আচরণ করার অক্ষমতা। একদিকে বেকার সমস্যা দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে অস্পৃশ্যতারূপী অপরাধ ও আমাদের ক্ষয়িষ্ণু ধর্মবিশ্বাসের অদ্বিতীয় কারণ হল এই অক্ষমতা।

"নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর ঋষিরা এই চতুর্বর্ণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন: একটি বর্ণের লোক শিক্ষাদান করবে, অপরটি দেশ রক্ষা করবে। তৃতীয়টি করবে সম্পদ সৃষ্টি এবং চতুর্থ বর্ণ শরীরশ্রমমূলক সেবার দায়িত্ব নেবে। (আমার ধর্ম : গান্ধীজী)

বর্ণ-ব্যবস্থা বা জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দেরও ভাবনার মূল সূত্র এখানে। স্বামীজীর মতে—"জাতিভেদ-সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—সত্য যুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা

শোনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণোত্তর সকল জাতিই ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইবেন।"

(উদ্বোধন : ভারতে বিবেকানন্দ)

এর পরেই স্বামীজীর বৈপ্লবিক ঘোষণা—

"উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।"

আমার মতে, বিবেকানন্দ-আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণ এই পথেই। গান্ধীজীর 'হরিজন আন্দোলন' তারই উত্তর কাণ্ড। আর এই প্রবন্ধে সে বিষয়েই সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা করার প্রচেষ্টা।

গান্ধীজীর মতে বর্ণ-ব্যবস্থা সমাজগঠনের সহায়ক, কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষ নয়। সমাজের অবক্ষয়ের মূলই হচ্ছে এই বর্ণ-বিদ্বেষ। এই বর্ণ-বিদ্বেষই মানুষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত হানে, বিশেষতঃ নিম্নবর্ণদের—যারা গান্ধীজীর হরিজন। তাই হরিজন-আন্দোলনের প্রথম কথাই হল—এদের মর্যাদা দান। সামাজিক মর্যাদা পেলে এরা অদ্ভুত কর্মক্ষমতা দেখাতে পারবে। সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য কর্মক্ষেত্রে অন্য বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে আত্ম-মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য হবে না।

এই বিষয় একজন আমেরিকান ধর্মযাজকের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা উল্লেখযোগ্য :

গান্ধীজী : "আমি যদি ঝাড়ুদার হই তবে আমার ছেলেও কেন তা হবে না ?"

ধর্মযাজক : "তাই নাকি ? আপনি তাহলে অতদূর যাবেন ?"

—"অবশ্যই। কারণ আমার মতে ঝাড়ুদারের পেশা ধর্মযাজকের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়।"

—"আমিও সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট না হয়ে কাঠুরে হলে কি ভাল হত ?"

—"কিন্তু একজন কাঠুরিয়া কেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হতে পারবে না ? গ্লাডস্টোন তো সখের কাঠুরিয়া ছিলেন।"

—"তিনি কিন্তু এটাকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নি।"

—"করলেও তাতে তাঁর অবস্থা খারাপ হত না। আমার বক্তব্য এই যে, ঝাড়ুদারের বংশে যাঁর জন্ম, তিনি ঐ বৃত্তি দ্বারাই নিজ জীবিকা অর্জন করবেন এবং এর পর তিনি যা খুশী করতে পারেন। কারণ একজন ঝাড়ুদার তাঁর পরিশ্রমের জন্য কোন আইনজীবী এমন কি আপনাদের প্রেসিডেণ্টের সমান পারিশ্রমিক পাবার অধিকারী। আমার মতে এরই নাম হিন্দুধর্ম। এর চেয়ে

ভাল সাম্যবাদ পৃথিবীতে আর নেই। বর্ণ-ধর্ম মাধ্যাকর্ষণের মতই শাশ্বত বিধান। উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে লম্ফন করে আমি মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে বাতিল করার প্রয়াস করতে পারি না। কারণ এ প্রচেষ্টা নিরর্থক। অনুরূপ ভাবে পরস্পরের উর্ধ্বে উল্লম্ফন করার চেষ্টাও অর্থহীন। বর্ণের বিধান মৃত্যুর দ্যোতক প্রতিদ্বন্দ্বিতাবৃত্তির একেবারে বিপরীত জিনিস। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে বিনাশ সাধন করে, পারস্পরিক সহযোগিতার দ্যোতক বলে বর্ণ-ধর্ম সেখানে বাঁচার পথ করে দেয়।" (আমার ধর্ম : আত্মকথা)

আর স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়োজন এখানেই। প্রয়োজন তাঁর যুক্তি-নির্ভর, বিজ্ঞান-নির্ভর বৈদান্তিক ব্যাখ্যার—যার অনুপ্রেরণায় ঝাড়ুদার পাবে আত্ম-মর্যাদা, দেশ-সেবায় সে হবে অপরিহার্য অঙ্গ। আত্ম-মর্যাদায়, আত্ম-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন সে বুঝবে তাকে ছুঁলে অন্য বর্ণের হৃদয় আর সঙ্কুচিত হয় না—কুঞ্চিত হয় না তাদের উদ্ধত নাসিকা তখন সে তার কাজকে 'ছোট' ভেবে অপমানিত বোধ করবে না। আত্ম-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে নিত্য-নূতন পদ্ধতিতে স্বদেশকে করবে আবর্জনা-মুক্ত। বংশ-পরম্পরায় অশিক্ষায় আর কুশিক্ষায় তার যে জীবন হয়ে উঠেছে অভিশপ্ত, আত্ম-মর্যাদা পেলে সেও আর বৌদ্ধিক-বিকাশে পিছিয়ে পড়বে না। স্বামীজীর মতে—"অদ্বৈতবাদ (বেদান্ত) কার্যে পরিণত করিবার উপায় নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর ; টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে। এইটুকু ভুল হইয়াছিল যে, এতদিন অদ্বৈতবাদ কেবল আধ্যাত্মিক দিকেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। এখন কর্মজীবনে উহা প্রয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর উহাকে রহস্য বা গোপনীয় বিদ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় বনে-জঙ্গলে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট আবদ্ধ থাকিবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে উহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে। রাজার প্রাসাদে, সাধু-সন্ন্যাসীর গুহায়, দরিদ্রের কুটীরে, সর্বত্র—এমন কি রাস্তার ভিখারী দ্বারাও উহা কার্যে পরিণত হইতে পারে।

"গীতায় কি উক্ত হয় নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' ?—এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের

কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্য-সন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—ওঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না। এখন অদ্বৈতবাদকে কার্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে—উহাকে এখন স্বর্গ হইতে মর্তে লইয়া আসিতে হইবে, ইহাই এখন বিধির বিধান। আমাদের পূর্বপুরুষগণের বাণী আমাদিগকে অবনতির দিকে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অতএব হে আর্য-সন্তানগণ, আর সে-দিকে অগ্রসর হইও না। তোমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ উচ্চ স্তর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর সকলের জীবনে প্রবেশ করুক, সমাজের প্রতি স্তরে প্রবেশ করুক, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি হউক, আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত হউক, আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া প্রতি শোণিতবিন্দুর সহিত উহা প্রবাহিত হউক।"

(ভারতে বিবেকানন্দ : উদ্বোধন)

বেদান্তকে 'এখন স্বর্গ হইতে মর্তে লইয়া আসিতে হইবে'—সত্যিই তা আজ সম্ভব হয়েছে এবং এই অসাধ্য-সাধন করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ নিজে। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে ধারণ করে ও সেই গঙ্গাস্রোতকে প্রবাহিত করে মুক্ত করেছিলেন বহু অভিশপ্ত আত্মাকে, স্বামীজীও সেইরকম বেদান্তের মহান সব ভাবরাশি কেবল ধারণই করেননি, মর্তভূমিতে বেদান্তের এক মহাপ্লাবন এনেছিলেন। সেই মহাপ্লাবনে ভেসে গিয়েছে উচ্চবর্ণের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত কুসংস্কাররাশি আর তাঁর এই নবীন ভাবধারায় পরিস্নাত হয়েছে 'জেলে-মালা-মুচি-মেথর-মুদ্দাফরাশ' প্রভৃতি অবহেলিত সম্প্রদায়। খসে পড়েছে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার মায়ার আবরণ। জেগে উঠেছেন তাদেরও অন্তরাত্মা। স্বামীজী তাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, যে আত্ম-শক্তিতে উচ্চবর্ণেরা জ্ঞানে-গুণে-কর্মে উন্নতশির, সেই একই আত্মা এতদিন 'মুচি-মেথর-মুদ্দাফরাশের' অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার ভেদ করে জেগে উঠতে পারেনি। আত্ম-মর্যাদা পেলে ও আত্ম-শক্তি জেগে উঠলে যে একই মানুষ ভিন্ন ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হতে পারে তার নিদর্শন স্বামীজী দেখেছেন আমেরিকায়। বলেছেন, "আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম—বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় বাস করিবার জন্য আসিতেছে। দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে—পদদলিত, আশাহীন। কেবল একটি কাপড়ের পুঁটলি তাহাদের সম্বল—কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, তাহারা ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাতের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখন দেখ, ছয়মাস বাদে সেই লোকগুলিই ভাল জামাকাপড় পরিয়া সোজা হইয়া চলিতেছে—সকলের দিকেই নির্ভীক

দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এমন অদ্ভুত পরিবর্তন কিভাবে আসিল? মনে কর, সে-ব্যক্তি আর্মেনিয়া বা অন্য কোন স্থান হইতে আসিতেছে—সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না, সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত—'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়তে চড়তে চেষ্টা করিস তোকে পিষে ফেলব।' চারদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম তুই, গোলাম আছিস যা আছিস, তাই থাক। জন্মেছিলি যখন, তখন যে-নৈরাশ্যের অন্ধকারে জন্মেছিলি, সেই নৈরাশ্যের অন্ধকারে সারা জীবন পড়ে থাক্।' সেখানকার হাওয়া যেন তাহাকে গুনগুন করিয়া বলিত, 'তোর কোন আশা নেই—গোলাম হয়ে চিরজীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়ে থাক্।' সেখানে বলবান্ ব্যক্তি তাহাকে পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইতেছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল—একজন ভাল পোষাক পরা ভদ্রলোক তাহার করমর্দন করিল। সে যে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, আর ভদ্রলোকটি যে উত্তমবস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা যে টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন—সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিতে বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, দেখিল—এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল—এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতরে সেও একজন মানুষ। হয়তো সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সহিত করমর্দন করিয়া আসিল, সেখানে হয়তো সে দেখিল—দূরবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে মলিনবস্ত্র পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেন্টের করমর্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম-মায়াবশে এইরূপ দুর্বল দাসভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—মনুষ্যপূর্ণ জগতে সেও একজন মানুষ।" (ভারতে বিবেকানন্দ : উদ্বোধন)

স্বামীজী-কথিত এই ঘটনায় অবহেলিত ও অবজ্ঞাত মানুষের যে ভাবে আত্ম-মর্যাদা ফিরে এসেছে, হয়েছে তাদের নতুন এক ব্যক্তি-সত্তার উন্মোচন, তা কিন্তু জ্ঞাতসারে হয়নি, তা হয়েছে দেশ-কাল-ভেদে সামাজিক কিছুটা উদারতায়। কিন্তু সমাজই যেখানে এইসব মানুষের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত হানে, চূর্ণ করে তাদের ব্যক্তিত্বকে—যার ফলশ্রুতি যুগ যুগ ধরে গ্লানিময় জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়া, স্বামীজীর মতে সেখানে তাকে এই বেদান্ত-জ্ঞানের হাতিয়ার নিয়ে সামাজিক সব কুসংস্কার ও হীনমন্যতার ব্যূহ ভেদ করতে হবে। 'অভীঃ'—এই মন্ত্রে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। প্রমাণ করতে হবে—অস্পৃশ্যতাবোধ আত্মার নয়। আত্ম-শক্তিতে সেও মহামহীয়ান। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে কোথাও তাদের দাবিয়ে রাখা যাবে না। এই হল ব্রহ্মভাবের উন্মোচন।

উনবিংশ শতকে স্বামীজীর মতো এমনভাবে কেউ আর মানুষের আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখাননি। এ শুধু বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বই নয়, মহান্ মনস্তত্ত্বও বটে। আত্মতত্ত্বে অবিশ্বাসী মনস্তাত্ত্বিকেরাও দেখতে পাবেন স্বামীজীর বাণী কী অফুরন্ত শক্তির খনি! মনঃশক্তি বা চিন্তাশক্তির জগতেও স্বামীজী অভূতপূর্ব নজির রেখে গেছেন। এ-বিষয়ে একবার বলেছিলেন—"বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছি, মনে হইয়াছে এইখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু অবশেষে ঐ মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে : আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই ; আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার কর। উঠ, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ এখানে সশরীরে বর্তমান আছি। সুতরাং যখনই অন্ধকার আসিবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিও, দেখিবে—সকল বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হইয়া যাইবে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তো স্বপ্নমাত্র। জীবনপথের বাধাবিঘ্নগুলি পর্বত-প্রমাণ, দুর্লঙ্ঘ্য ও বিষাদময় বলিয়া মনে হইলেও ওগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয় করিও না, দেখিবে উহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। নিষ্পেষণ কর, দেখিবে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ; পদদলিত কর, দেখিবে মরিয়া গিয়াছে। ভীত হইও না। বার বার বিফল হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। কাল নিরবধি, অগ্রসর হইতে থাকো, বার বার তোমার শক্তি প্রকাশ করিতে থাকো, আলোক আসিবেই। জগতে প্রত্যেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? কে তোমাকে সাহায্য করিবে? মৃত্যুর হাত কে এড়াইতে পারিয়াছে? কে তোমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার উদ্ধারসাধন তোমাকেই করিতে হইবে। তোমাকে সাহায্য করার সাধ্য অপর কাহারও নাই। তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আত্মাকে জানো, উঠ, জাগো ; ভীত হইও না। দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে আত্মাকে প্রকাশ কর,—প্রথমে ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলিয়া মনে হউক না কেন।" (স্বামীজীর বাণী ও রচনা : দ্বিতীয় খণ্ড)

উনবিংশ শতাব্দীতে এই তরুণ সন্ন্যাসীর আন্দোলন ভারতের নবজাগরণে তাই এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছিল। এই বিপ্লব কোন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই বিপ্লব মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগানোর বিপ্লব—সে-শক্তি পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার জড়বাদের শক্তি নয়—সে-শক্তি

মানুষকে ক্ষমতা ও দৈহিক সুখভোগের জন্য লড়াই করতে প্রবৃত্তি দেয় না। এই শক্তি হল মানুষেরই আত্মিক শক্তি। এই আত্মিক শক্তিতেই মানুষ মহৎ হয়। এই শক্তির মূল হচ্ছে ভারতের অতি সুপ্রাচীন ধর্মীয় মতবাদ—বেদান্ত, যা প্রাচীন ভারতের ঋষিদের অন্তরাত্মায় উদ্ভাসিত।

আবার গান্ধী-প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তিনিও অস্পৃশ্য ও অবহেলিতদের 'হরিজন' নাম দিয়ে তাঁর 'হরিজন আন্দোলনে'র সূত্রপাত করেন। তাঁর আন্দোলনের মূলেও অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির প্রেরণাই কাজ করেছে। বলেছেন, "মানুষকে ভালবাসার কারণে জীবনের প্রথম ভাগেই আমাকে অস্পৃশ্যতারূপী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মা একবার বলেছিলেন, 'এ ছেলেটিকে তুমি ছোঁবে না—এ অস্পৃশ্য।' আমি উল্টো প্রশ্ন করলাম, 'কেন ছোঁব না?' সেই থেকেই আমার বিদ্রোহ শুরু হল।"

[আমার ধর্ম : হরিজন পত্রিকা (২৪-১২-৩৮ পৃঃ ৩৩৯)]

"আমরা সকলে একই রঙে রঞ্জিত এবং সেই এক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টার সন্তান। এই কারণে আমাদের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিও অসীম। তাই একটি মাত্র মানুষকে তুচ্ছ করার অর্থ সেই ঐশী শক্তির অপমান। এতে সেই ব্যক্তির অন্তরস্থিত ঐশী সত্তাকেই কেবল আঘাত করা হয় না, তাবৎ বিশ্বচরাচরের ঐশী সত্তার অবমাননা হয়।" [আমার ধর্ম : আত্মকথা (১৯৪৮ খৃঃ সংস্করণ)]

গান্ধীজীর এই বাণী বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি। তাই স্বামীজী ও গান্ধীজী উভয়েই সমাজের একই জায়গায় আঘাত করেছেন। স্বামীজীর মতো গান্ধীজীরও এ-বিষয়ে আপোষহীন মনোভাব। যে ধর্ম মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, গান্ধীজীর মতে তা কোন ধর্মই নয়—হিন্দুধর্ম তো নয়ই। হিন্দুধর্ম নাম দিয়ে উচ্চবর্ণদের প্রচলিত কুসংস্কারকে গান্ধীজী বলেছেন—"শয়তানের আবিষ্কার।" তাই যেসব শাস্ত্রবিধি অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে তিনি তাও মানতে রাজী নন। গান্ধীজীর মতে কোন কু-প্রথাকে প্রাচীনত্বের দোহাই দিলেই সমর্থন করা যায় না। এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। বলছেন—

"ছুঁৎমার্গ প্রথাকে বরদাস্ত করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর হয়নি। এ-প্রথাকে চিরকালই আমার অনাবশ্যক বলে মনে হয়েছে। এ-কথা সত্য যে এ প্রথা বহু প্রাচীন; কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত আরও বহু কুপ্রথাই তো এইরকম প্রাচীনত্বের দোহাই দিতে পারে। মেয়েদের দিয়ে একরকম বেশ্যাবৃত্তি চালান যে হিন্দুধর্মের অঙ্গ—এ কথা ভাবতেও আমার লজ্জা বোধ হয়। তা সত্বেও ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই (দেবদাসী-অনুঃ) প্রথা হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান। কালীমায়ের সামনে ছাগ বলি দেওয়া আমার মতে প্রত্যক্ষ অধর্মাচরণের নিদর্শন এবং পশুবলি দেওয়ার প্রথাকে আমি তাই হিন্দুধর্মের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করি না। হিন্দুধর্ম বহু যুগ ধরে ক্রমে ক্রমে বিকশিত

হয়েছে। হিন্দুধর্ম—এই নামটিই বিদেশীদের দেওয়া। হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের ধর্মমতকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এ কথা যথার্থ যে, একদা ধর্মের নামে পশুবলি দেওয়া হত। কিন্তু এ ধর্মাচার নয়, হিন্দুধর্ম তো নয়ই। এইভাবে আমার মনে হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ধর্মবিশ্বাসের পর্যায়ে পরিণত হবার পরও যাঁরা গোমাংস আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন, তাঁদের সমাজচ্যুত করা হয়। সে সময়কার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ নিশ্চয় ভীষণাকার ধারণ করেছিল। কেবল বিরোধীদেরই প্রতি সামাজিক বয়কটের আয়ুধ প্রয়োগ করা হয়নি, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরও পিতৃপুরুষের পাপের দায়ভাগী করা হয়। যে প্রথার জন্মের মূলে একদা হয়তো কোন সদভিপ্রায় ছিল, কালক্রমে তা নির্মমরূপ পরিগ্রহ করল। এর ফলে আমাদের ধর্মশাস্ত্রসমূহে এমন সব শ্লোকের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল—যার বলে এই কুপ্রথাকে স্থায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হল। অথচ এ প্রথা একেবারেই অবাঞ্ছনীয় এবং তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, এর মূলে কোন যৌক্তিকতা নেই। অস্পৃশ্যতা-প্রথার জন্ম সম্বন্ধে আমার এই মতবাদ যথার্থ হোক বা না-ই হোক, ছুঁৎমার্গ যুক্তিবাদের বিরোধী এবং করুণা ও প্রেমবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্করহিত। যে ধর্মে গোপূজার স্থান রয়েছে, সে ধর্ম নিশ্চয় মানুষকে নিষ্ঠুর এবং অমানুষিকভাবে বয়কট করার প্রথাকে সমর্থন করতে পারে না। আর এইসব চিরকালের উপেক্ষিত মানুষদের সঙ্গ বর্জন করার পরিবর্তে আমি বরং নিজের দেহকে শতখণ্ডে খণ্ডিত করাকে অধিকতর কাম্য মনে করব। হিন্দুধর্মকে আমি নিজ জীবনাপেক্ষা প্রিয় বিবেচনা করি বলে তার এই কলঙ্ক আমার কাছে অসহনীয় বোঝার মত মনে হয়।”

[আমার ধর্ম : ইয়ং ইণ্ডিয়া, (৬-১০-২১)]

ভাবতে অবাক লাগে—যাঁর জীবনে ধার্মিকের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, আহারে-বিহারে যিনি সম্পূর্ণ শুচিশুদ্ধ, তিনি কিন্তু মানবিকতার ব্যাপারে ধর্মের দোহাই দিয়ে আদর্শকে নীচে নামাতে চাননি। ছোটবেলায় যেমন তিনি ছুৎমার্গের ব্যাপারে নিজের জননীকেও সমর্থন করতে পারেননি, সেইরকম সারাজীবন হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও জাতিভেদের অন্তরালে অস্পৃশ্যতাকে বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানবিকতার ব্যাপারে স্বামীজীর মতো বেদই ছিল তাঁর আদর্শ শাস্ত্র। বলেছেন—“বেদের মূল তত্ত্ব হল পবিত্রতা সত্য কলুষবিহীনতা শুদ্ধতা নম্রতা সারল্য ক্ষমা ঐশীভাবনা এবং এই জাতীয় আর যা কিছু কোন পুরুষ বা রমণীকে মহৎ ও সাহসী করতে পারে। দেশের মহান ও মূক সেবক মেথর সম্প্রদায়কে কুকুরের চেয়ে অধমজ্ঞানে হীন ও ধিক্কারের পাত্র মনে করার পিছনে মহত্ত্ব বা সাহসিকতা—কোন কিছুই নেই।”

অস্পৃশ্যর প্রতি এই সহানুভূতি ও ভালবাসা—তা তো কোন ভাবের আবেগ নয়—মহৎ-হৃদয়ের মণিকোঠাতেই তা সঞ্চিত থাকে—তাঁদের সেই হৃদয়-মথিত করুণাধারায় নবজীবন লাভ করে অসহায় ও বঞ্চিত মানুষেরা। আসুন, এখানে আমরা স্বামীজীর জীবনের একটি অধ্যায়ের অনুধ্যান করি—যা প্রেম, ভালবাসা ও করুণার প্রতিচ্ছবি। স্থান—বেলুড় মঠ।

"মঠের জমির জঙ্গল সাফ্ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামীজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন,—'আমি এখন দেখা করতে পারবো না, এদের নিয়ে বেশ আছি।' বাস্তবিকই সেদিন স্বামীজী ঐ সকল দীন দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না।

"সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল—'কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামীজীকে বলিত—'ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমাদের কাজের বেলা এখান্‌কে আসিস্ না—তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; আর বুড়ো বাবা এসে বকে।' শুনিয়া, স্বামীজীর চোখ ছল্‌ছল্ করিত এবং বলিতেন—'না না, বুড়ো বাবা বকবে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল্',—বলিয়া, তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

"একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন—'ওরে তোরা আমাদের এখানে খাবি?' কেষ্টা বলিল—'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ্।' স্বামীজী বলিলেন—'নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে তো খাবি?' কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল—'হাঁরে স্বামী বাপ্—তোরা এমন জিনিসটা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।' স্বামীজী তাহাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন—'তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।' স্বামীজী যে দরিদ্র-নারায়ণের কথা বলিতেন, তাহা তিনি নিজে এইরূপে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

"আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন —'এদের দেখলুম, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি।' অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরীব দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম—মাকে কত বল্লুম—'মা! এখানে লোকে ফুলের বিছানায় শুচ্চে, চর্ব্য চূষ্য খাচ্চে, কি না ভোগ করছে!—আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা! তাদের কোন উপায় হবে না'? ওদেশে ধর্ম প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে দু'বেলা দুমুটো খেতে পায় না দেখে, এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া—ফেলে দিই তোর লেখা পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধন-বলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়ি পাতি জোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

"আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড —যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব উঠে--হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাইরে! এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি, কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে' 'ছুঁস্‌নে'! দেশে কি আর দয়া ধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার্ ঝাঁটা—মার্ লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্'—বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? হায়! এরা দুনিয়াদারী কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভিতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছে,

কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে, রক্তসঞ্চার না হলে, কোনও দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে, দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও, ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানবি।"

(স্বামী-শিষ্য সংবাদ : শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : উত্তর কাণ্ড)

পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই জাতীয় জীবনকে নিরাময় করাই ছিল স্বামীজীর ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই স্বামীজীর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ। এই ব্রতের এক সর্বাঙ্গীণ রূপ দিতেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা তাঁর আন্দোলনেরই সার্থক সূচনা। তিনি তথাকথিত সমাজসংস্কারকদের উপর কোন ভরসা রাখতে পারেননি। তাঁদের কূপমণ্ডুক নীতি স্বামীজীর পক্ষে ছিল অসহ্য। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি কোন নীতিই কূপমণ্ডুকের চতুর্দেয়ালের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এর উপর আছে আবার ভারতীয়দের জাতিগত রোগ—ভেদনীতি। জাতিভেদ, ধর্মভেদ প্রভৃতিতে জাতীয় জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত। তাই স্বামীজী সখেদে বলেছিলেন—"যে জাতি শত শত বৎসর যাবৎ এক গ্রাস জল 'ডান হাতে খাইব, কি বাম হাতে খাইব' এইরূপ গুরুতর সমস্যাগুলির বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পারো? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় পৌছিয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?"

সত্যিই এই জাতি ধুঁকছিল। জাতির যতটুকু প্রাণ-প্রবাহ বইছিল তার ধর্মে—তার প্রাচীন ঐতিহ্যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের কূটনীতি-চালে তাও বিভ্রান্ত—জড়বাদের পথে পর্যুদস্ত। শিক্ষিতেরা বুদ্ধিজীবীরা যখন জড়-সভ্যতার চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত, ইংরেজের কূটনীতি সেই সুযোগে তখন গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে উচ্চবর্ণদের উৎপীড়নে বিপর্যস্ত অবহেলিত অবজ্ঞাত মানুষদের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে তারা কার্যসিদ্ধি করছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হাতিয়ার জনসমষ্টি, তাদের কব্জা করতে পারলে কে তাদের হঠায় এই সুজলা-সুফলা ভূমিখণ্ড হতে? উপায় তারা ঠিক খুঁজে বের করেছিল। এই জাতির মেরুদণ্ডে—তার ধর্মে আঘাত করো। বহু শতাব্দীর বর্বর আক্রমণে তার প্রাচীন ঐতিহ্য—তার সনাতন ধর্ম কতকগুলি কুপ্রথা আর কদাচারে এসে দাঁড়িয়েছে। অস্পৃশ্যতার বাতাবরণে বেদ-বেদান্ত উচ্চবর্ণের মস্তিষ্ক-বিলাসে পরিণত হয়েছে। এই সুযোগ, আঘাত করো জাতির মর্মমূলে। হিন্দুর ধর্ম, ও তো পৌত্তলিকতা। ওতে কী আছে? এসো খৃষ্টের কাছে, শান্তি পাবে, পাপ-তাপ, মলিনতা দূর

হবে. তোমাদের জাতির কাছে তোমরা অভিশপ্ত। হিন্দুধর্ম তোমাদের স্বীকৃতি দেয়নি. দিয়েছে ঘৃণা! এসো এই নবীন ধর্মের পতাকাতলে—স্বীকৃতি পাবে।

স্বামীজী ইংরেজের এই কূটনীতি-চালের ভয়াবহরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতের জাতীয় জীবনের এই দুরবস্থা দেখে কতবার তিনি রাগে ফেটে পড়েছিলেন উচ্চবর্ণদের উপর। বলেছেন তাঁদের—তাঁরা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের 'কংকাল'। তাঁদের উপর আর কোন আশা নেই। তাঁদের আহাম্মকি তিনি বারবার তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, সর্বনাশ যা করার তা তো করেছ, আর এগিয়ো না। তাঁর নিজের ভাষায়—"তোমরা যদি সাবধান না হও, তবে মাদ্রাজের পঞ্চমাংশ, এমন কি অর্ধেক খৃষ্টান হইয়া যাইবে। মালাবার দেশে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূর্খতা জগতে আর কি থাকিতে পারে? 'পারিয়া' বেচারাকে উচ্চবর্ণের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু যে মুহূর্তে সে খৃষ্টান হইয়া পূর্বনাম বদলাইয়া একটা যা-হোক ইংরেজী নাম লইল বা মুসলমান হইয়া মুসলমানী নাম লইল, আর কোন গোল নাই, সব ঠিক। এইরূপ দেখিয়া ইহা ছাড়া আর কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, মালাবারবাসীরা সব পাগল, তাহাদের গৃহগুলি এক-একটি উন্মাদ-আশ্রম, আর যতদিন তাহারা নিজেদের প্রথা আচারাদির সংশোধন না করিতেছে, ততদিন তাহারা ভারতের প্রত্যেক জাতির ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকিবে। এইরূপ দূষিত ও পৈশাচিক প্রথাসমূহ যে এখনও অবাধে রাজত্ব করিতেছে, ইহা কি তাহাদের ঘোরতর লজ্জার বিষয় নয়? নিজেদেরই সন্তানগণ অনাহারে মরিতেছে—আর যে মুহূর্তে তাহারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, অমনি তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়।"

(উদ্বোধন : ভারতে বিবেকানন্দ)

স্বামীজী রুখতে চেয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের এই অনিবার্য অবক্ষয়কে। তাই তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল বৃহত্তর জনসমষ্টির দিকে। তাঁর আন্দোলনে প্রথম তিনি ডাক দিয়েছিলেন এদেরই। ডাক দিয়েছিলেন এমনই সব অগণিত শ্রমজীবীদের—যারা উচ্চবর্ণদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত। স্বামীজী এদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন আর খুলে দিয়েছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণদের নির্লজ্জ মুখোশ! শুরু হল তাঁর কর্ম, প্রেরণা, ধ্যান-ধারণা সবকিছু এইসব বঞ্চিত অসহায় নিপীড়িত মানুষকেই কেন্দ্র করে। আজকে যাঁরা এইসব মানুষের হয়ে সাম্য ও সমানাধিকারের কথা বলছেন, তাঁরাই বা ক'জন স্বামীজীর আন্দোলনের পুরো খবর রাখেন? সেই যুগে যখন উচ্চবর্ণদের একচ্ছত্র আধিপত্য, রক্ষণশীলদের কুসংস্কার ও অনাচারে অতিষ্ঠ যখন জনজীবন, তখন তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কথা বলা কম সাহসিকতার ব্যাপার নয়; স্বামীজী

নির্ভীক-কণ্ঠে বললেন,—"ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"

তাই একথা বললে মোটেই ভুল হবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের সার্থক সূচনা অস্পৃশ্য মানুষকে কেন্দ্র করেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁকে বলেছিলেন,—'জীবে দয়া নয়—সেবা'; তা স্বামীজীর মধ্য দিয়ে ভারতের এইসব অবহেলিত মানুষদের মাঝেই যথার্থ উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

একথা আজ হয়তো অনেকে কল্পনাও করতে পারবেন না যে, স্বামীজীকে সে সময় কী প্রচণ্ড বিরোধিতারই না সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে এদেশী রক্ষণশীল সম্প্রদায়, অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারীগণ। রক্ষণশীলেরা তো স্বামীজীকে সন্ন্যাসী বলে মানতেই চাইত না, কেউ কেউ আবার স্বামীজীদের কাজকারবার দেখে—যেমন, অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করে সুস্থ করে তোলা, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বিপন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা, কলকাতায় প্লেগ-মহামারীর সময় জঞ্জাল সাফ করা—এইসব কাজকর্ম দেখে তারা স্বামীজী ও তাঁর অনুগামীদের একটু অনুকম্পা করত, বলত—'ভাঙ্গি সাধু!' অর্থাৎ 'মেথর-সাধু!'

ভাঙ্গি সাধু! এক অর্থে একথা সত্যও বটে। সমাজের অনেক জঞ্জালই তাঁকে সাফ করতে হয়েছিল। তা হল ধর্মের নামে কুসংস্কারের ডাঁই জঞ্জাল—সনাতন হিন্দুধর্মের কলংক—রক্ষণশীলদের পাপের বোঝা। শুধু কী বাইরের জঞ্জাল সাফ, সমাজে আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে যে প্রতারণা চলছিল, ধর্মকে আড়াল করে যেসব কুরুচি ও কুপ্রথার প্রভাবে জনমানসে সঞ্চিত হয়েছিল ক্লেদ-কালিমা, তাও তাঁকে সাফ করতে হয়েছিল প্রবল বিরোধিতার সঙ্গে যুঝে।

বিবেকানন্দ-ভাবাশ্রিতা চার কন্যা

স্বামী বিবেকানন্দের স্বনামধন্যা মানসকন্যা অনন্যা নিবেদিতার (মিস্ মার্গারেট নোবেল) কথা আমরা সকলেই কিছু-না কিছু জানি। কিন্তু নিবেদিতা স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসার আগে আরও চারজন বিদেশিনী কন্যা স্বামীজীর ভাবধারায় অভিষিক্ত হয়ে বিবেকানন্দ-আন্দোলনে কীভাবে কাজ করে গেছেন, তা হয়ত আমাদের অনেকেরই জানা নেই। এমনকি একসময় বিদেশে নিন্দা-কুৎসা-ঈর্ষায় বিধ্বস্ত বিবেকানন্দকে সেদেশে বেদান্ত প্রচারে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন এই চারকন্যাই। হ্যাঁ, এঁরা চারজনই ছিলেন বিদুষী, রূপসীও বটে। এঁরা চারজনই স্বামীজীর সেই বিখ্যাত 'হেল' পরিবারের। স্বামীজী কোনোদিনই এঁদের কথা ভুলতে পারেননি। এই পরিবারের কর্তা ছিলেন জর্জ ডব্লিউ হেল (Mr. G. W.Hale) আর তাঁর পত্নী মিসেস্ হেল স্বামীজী যাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদানেচ্ছু অপরিচিত বিবেকানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীকে কী অপার্থিব স্নেহ ও মমতায় এই শ্রীমতী হেল সাদরে নিজ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে কাহিনী বারবার শুনলেও যেন তৃপ্তি হয় না।

কথায় বলে, বাস্তব ঘটনা মাঝে মাঝে উপন্যাসের চেয়েও চমকপ্রদ হয়। এক নিঃস্ব অখ্যাত ভারতীয় সন্ন্যাসীর আমেরিকাগমন এবং রাতারাতি বিশ্ব-খ্যাতির চেয়ে চমকপ্রদ 'রোমান্স' বাস্তব জগতে আর কী ঘটতে পারে? একবার কল্পনা করুন, ধূলিধূসরিত ক্লান্ত-অবসন্ন সেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে—যিনি কোনো হোটেলে আশ্রয় না পেয়ে আমেরিকার এক অভিজাত পল্লীতে হতাশ মনে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হলেন এবং প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে বাঁচার আর অন্য কোন উপায় না পেয়ে রেল কোম্পানির একটি খালি প্যাকিং বাক্সের (কোনো কোনো মতে একটি খালি মালগাড়িতে) ভিতরে আশ্রয় নিলেন এবং হতাশা, ক্ষুধা ও শীতে কাতর হয়ে সেখানেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। এর পরের ঘটনাটি মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' পুস্তকে লিখেছেন। ঘটনাটি হল—"পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার চোখেমুখে 'মিঠা জলের হাওয়া' লাগিল। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইবামাত্র 'হ্রদতীরবর্তী' ধনীদিগের বাসগৃহ সুশোভিত রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। এই 'লেকশোর ড্রাইভ'-এর ধারেই সব ক্রোড়পতি বণিকদের অট্টালিকা। তিনি তখন ক্ষুধায় কাতর; অতএব সন্ন্যাসীরই মতো দ্বারে দ্বারে অন্নের জন্য এবং মহাসভার অফিসের ঠিকানা জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। ময়লা পোশাক, কালো রং এবং ক্লান্ত চেহারা দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে রূঢ় ভাবে তাড়াইয়া দিল; অন্যত্র ভৃত্যেরা হাসিঠাট্টা করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সুসভ্য আমেরিকায় ভিক্ষুকের বিশেষতঃ কালো আদমীর স্থান নাই। হৃদয় বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। টেলিফোন প্রভৃতির সাহায্য কিরূপে লইতে হয় তাহাও তাঁহার জানা ছিল না। অবশেষে হতাশমনে পথিপার্শ্বে বসিয়া তিনি শ্রীভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঠিক সম্মুখবর্তী এক ধনীর গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং রাজরানী-সদৃশ এক মহীয়সী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া অতি মৃদু ভদ্রতাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?" স্বামীজী নিজ বিপদের কথা খুলিয়া বলিলেন। অমনি সেই ভদ্রমহিলা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, একটি কক্ষে যেন আরামের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তিনি স্বামীজীকে বলিয়া রাখিলেন যে, প্রাতরাশের পর তিনি তাঁহাকে লইয়া মহাসভার অফিসে যাইবেন। এ যেন রূপকথার কাহিনীরই ন্যায় বিপদ হইতে মুক্তিলাভ। আর ভগবানের লীলাখেলা কী অচিন্তনীয়। স্বামীজীর হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই মহিলাটি ছিলেন শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ হেল-এর পত্নী; সেদিন হইতে তিনি, তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ স্বামীজীর অতি নিকট আত্মীয়ে পরিণত হইলেন। শ্রীযুক্ত হেল ও শ্রীযুক্তা হেল ছিলেন অতি ধর্মপ্রাণ; তাই স্বামীজী তাঁহাদের বলিতেন 'ফাদার-পোপ' (পোপ-বাবা) ও 'মাদার-চার্চ' (মা গির্জা)। আর হেলের কন্যাদ্বয় ও ভাগিনেয়ীদ্বয় (বাংলায় স্বামীজীর পত্রাবলীতে আছে দুই ভাইঝি) ছিলেন তাঁহার ভগিনী।" (যুগনায়ক পৃঃ ১৮-১৯)

'হেল' পরিবারের এই চারকন্যার নাম যথাক্রমে হ্যারিয়েট হেল, মেরী হেল, হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলি ও ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি। এঁদের নিয়েই এই প্রবন্ধ। এঁদের পবিত্র-স্বভাব ও সহৃদয়তার কথা স্বামীজী বহুভাবেই বলেছেন, তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রেও এই চারকন্যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। বস্তুতপক্ষে, এই চারকন্যাই বিদেশে জীবনযাপনে অনভ্যস্ত বিবেকানন্দকে খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে সহায়তা করেন এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে লোক ব্যবহার সম্বন্ধে স্বামীজীকে ওয়াকিবহাল করে বিভিন্ন সময়ে নানা হয়রানির হাত থেকেও তাঁকে বাঁচিয়েছেন। এই 'হেল' পরিবারে বসবাসের কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী স্বদেশে এক পত্র লেখেন তাতে অন্যান্য খবরের সঙ্গে 'হেল' পরিবারের এই চারকন্যারও বিবরণ দেন এক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে। লেখেন—"হেল আর তাঁর স্ত্রী, বুড়ো-বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। চারজনেই যুবতী—বেথা করেনি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গামা। প্রথম মনের মতো বর চাই।

দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে। ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড় নারাজ। এই রকম করতে করতে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড়-মানষের ঝি, ইউনিভার্সিটি গার্ল—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া। অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না। তারা বোধ হয় বে-থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

"মেরী আর হ্যারিয়েট হল মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট আর ইসাবেল হল ভাইঝি। মেয়ে দুটির চুল সোনালী ব্লণ্ড, আর ভাইঝি brunette অর্থাৎ কালো চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—এরা সব জানে।" (স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, সংখ্যা ১২২)। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এমনি ছিলেন সেই চারকন্যা। এবং এই চারকন্যার সহায়তা ছাড়া স্বামীজীর আমেরিকা-প্রবাসের প্রথম দিনগুলি যে মোটেই সুখকর হত না, তা বলাই বাহুল্য। সংসারে ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যে যে স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক দেখা যায়, দূর প্রবাসে স্বামীজী ও 'হেল' পরিবারের এই চারকন্যার মধ্যেও সে-সময় এই সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বামীজী কখনো তাঁদের আদর করে ডাকতেন 'স্নেহের খুকীরা' বলে। কখনো আবার ঠাট্টা করে বলতেন 'ঘরের আইবুড়ো মেয়ে'। আর এই 'আইবুড়ো খুকীরা' স্বামীজীর একটু কাজে লাগার জন্য নিজেদের মধ্যে সব সময়ই প্রতিযোগিতা করতেন—তা যতই সামান্য হোক না কেন সে-কাজ। স্বামীজীর নিজের কথায়—"এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা। আমাকে যেন বাচ্ছাটির মতো ঘাটে-মাঠে দোকান-হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকির সিকিও করতে পারিনি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর। এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা!" (পত্রাবলী, সংখ্যা. ১২২)

এরপরে স্বামীজীর যখন বিশ্বখ্যাতি হল এবং তিনি পাশ্চাত্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিভ্রমণ করে বেদান্ত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, সেই সময়ও তিনি এই দয়ালু 'হেল' দম্পতি ও চারকন্যাকে ভোলেননি। তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্বদাই তাঁর গতিবিধির বিষয় 'হেল' পরিবারকে অবহিত রাখতেন। বস্তুতপক্ষে একসময় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল এই 'হেল' গৃহই। তাঁর পত্রাবলীতে দেখা যায়, তিনি সব সময়ই চিঠি দিয়েছেন 'হেল' পরিবারে। নানা ব্যস্ততার মধ্যেও গৃহ-কর্ত্রী শ্রীমতী হেলকে তাঁর কাজকর্মের কথা লিখছেন, আবার সময় সুযোগ পেলে তাঁর স্নেহের ভগিনীদেরও নানা মজার কথা লিখে হাসাচ্ছেন (ক্ষ্যাপাচ্ছেনও)। ম্যাসাচুসেটসের সোয়ামস্কট থেকে

চারকন্যাকে উদ্দেশ করে লেখা স্বামীজীর এমনি একটি চিঠির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। লিখছেন—

"স্নেহের খুকীরা (Dear Babies),

দেখো, আমার চিঠিগুলো যেন নিজেদের বাইরে না যায়। দেখছো তো সমাজে আমি কি রকম বেড়ে চলেছি। 'প্রান্তর মাঝে' (dans la plaine) ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট আমায় শিখিয়েছিল। জাহান্নমে যাক। এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটিপাটি। এইরকম করে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল।·· আঃ, এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা, যখন ভাবি তোমরা চারজন গরমে ভাজা পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, আর আমি এখানে কী তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা।"

এবং সবশেষে আশীর্বাণী কিছু ফরাসী শব্দ চয়ন করে, যথা—"May you be all happy, dear fin de siecle young ladies, is the constant prayer of Vivekananda."

অর্থাৎ "স্নেহের আধুনিকারা। তোমরা সকলে সুখী হও— সর্বদা এই প্রার্থনা বিবেকানন্দের।" (পত্রাবলী, সংখ্যা ১১০)

কিন্তু পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের বিজয়-অভিযান সর্বদা বড় সুখের ছিল না। রাতারাতি তাঁর বিশ্বখ্যাতিতে অত্যন্ত ঈর্ষা ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন কিছু মানুষ। বিশেষত কিছু মিশনারী, কারণ বিবেকানন্দের প্রভাবে তাঁদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই নষ্ট হতে বসেছিল সে-সময়। এবং তাঁদের সঙ্গে এসে হাত মেলালেন কিছু ভারতীয় ধর্ম-প্রচারক। তাঁরা একজোট হয়ে সেই সময় প্রচার করতে লাগলেন—বিবেকানন্দ আসলে কোন সন্ন্যাসীই নয়, একজন ঠগ, প্রতারক—যে আমেরিকায় এসে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়েছে।

কী মর্মান্তিক যাতনায় স্বামীজী সে সব দিন কাটিয়েছেন তার অনেক কাহিনীই আমরা জানতে পেরেছি মেরী লুই বার্ক লিখিত বিশাল গ্রন্থ থেকে (Swami Vivekananda in the West, 3 Volumes)। সেই সময় যাঁরা স্বামীজীর পক্ষ অবলম্বন করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর বিরুদ্ধে কুৎসানিন্দার প্রতিবাদ জানাতে থাকেন, 'হেল' পরিবারের সেই চারকন্যাও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'Justitia' ছদ্মনাম নিয়ে এক ভদ্রমহিলা (ইনি কি সেই চারকন্যাদেরই একজন ?) এইসব মিশনারি ও কুৎসাকারীদের কিছু মোক্ষম জবাব দিয়েছিলেন পত্রিকার মাধ্যমে।

এইসব যাতনার মাঝে স্বামীজী তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে শুধু এইটুকুই

আশা করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর সমর্থনে ভারতে এমন কিছু করুক, যাতে প্রমাণিত হয়, বিবেকানন্দ যথার্থই একজন সন্ন্যাসী এবং স্বদেশের হিতের জন্যই তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে পাশ্চাত্ত্যে এসেছেন। কিন্তু হায়, মাসের পর মাস কেটে গেল, বাড়তে লাগল মিশনারিদের কুৎসা ও নিন্দা প্রচার কিন্তু স্বামীজীর বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর স্বদেশবাসী কেউই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মিশনারি অপপ্রচার রোধ করতে এগিয়ে এল না।

অবশেষে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা মিলিত হয়ে টাউন হলে স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্মপ্রচারের সাফল্য উপলক্ষে যখন এক ধন্যবাদজ্ঞাপক সভার আয়োজন করলেন এবং সেই অভিনন্দনপত্র তাঁর হাতে যখন এসে পৌছল এবং ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি সেই উপলক্ষে বিবেকানন্দস্তুতিতে মুখর হয়ে উঠল, তখন তিনি শিশুর মতোই কেঁদে উঠেছিলেন। এবং তাঁর সেই অবরুদ্ধ ভাবাবেগ প্রথম বেরিয়ে এসেছিল তাঁর অতি স্নেহের চার ভগিনীর কাছে লিখিত একটি চিঠিতেই। লিখেছিলেন—

"ভগিনীগণ,

জয় জগদম্বে! আমি আশারও অধিক পেয়েছি। মা, আপন প্রচারককে মর্যাদায় অভিভূত করেছেন। তাঁর দয়া দেখে আমি শিশুর মতো কাঁদছি। ভগিনীগণ, তাঁর দাসকে তিনি কখনো ত্যাগ করেন না। আমি যে চিঠিখানি [অভিনন্দনপত্র] তোমাদের পাঠিয়েছি, তা দেখলে সবই বুঝতে পারবে। আমেরিকার লোকেরা শীঘ্রই ছাপা কাগজগুলি পাবে। পত্রে যাঁদের নাম আছে, তাঁরা আমাদের দেশের সেরা লোক। সভাপতি ছিলেন কোলকাতার এক অভিজাত শ্রেষ্ঠ [প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়], অপর ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়। তাঁর এই মর্যাদা গভর্ণমেন্টেরও অনুমোদিত। ভগিনীগণ! আমি কি পাষণ্ড! তাঁর এত দয়া প্রত্যক্ষ করেও মাঝে মাঝে বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে ফেলি। সর্বদা তিনি রক্ষা করছেন দেখেও মন কখনো কখনো বিষাদগ্রস্ত হয়। ভগিনীগণ, ভগবান একজন আছেন জানবে—তিনি পিতা, তিনি মাতা, তাঁর সন্তানদের তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন না—না, না না। নানা রকম বিকৃত মতবাদ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সরল শিশুর মতো তাঁর শরণাগত হও। আমি আর লিখতে পারছি না। মেয়েদের মতো কাঁদছি। জয় প্রভু, জয় ভগবান!

তোমাদের স্নেহের বিবেকানন্দ।" (পত্রাবলী, সংখ্যা ১০৮)।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের এ ধরনের মানবিক আর্তনাদ চার কন্যারা শুধু একবারই শুনেছিলেন, তবে তাঁর সেই হৃদয়-মথিত অশ্রুধারা উদগত হয়েছিল সমগ্র মানবজাতি, বিশেষত তাঁর স্বদেশবাসীদের কল্যাণের জন্যই। তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতেও অভ্যস্ত ছিলেন না।

বিবেকানন্দের এ ধরনের আপোষহীন মনোভাবের কথা ভালভাবেই জানতেন সেই চার কন্যা। তাই তাঁরা যখনই তাঁর কোন বিপদের, এমনকি প্রাণহানির পর্যন্ত আশঙ্কা করে সাবধান করে দিতে গেছেন তাঁকে, আহত সিংহের মতো স্বামীজী তখনই গর্জে উঠেছেন। সেই অবস্থায় একবার চার কন্যাদের একজনকে (মিস্ মেরী হেলকে) লিখেছিলেন—"আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব, হিন্দুভাবেও নয়, খ্রীষ্টানভাবেও নয়, বা অন্য কোনভাবেও নয় ; আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ভাবে রূপ দিব—এইমাত্র। ···কী ! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব ! ভগিনী, আমার এ কথা ভুল বুঝিয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না। তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, 'যাহা যুক্তিকে অযুক্তিতে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পর্যবসিত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে।'···

"আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গির্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমাশিগুলোকে, তাহার সুন্দর মুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে—সর্বোপরি ধর্মের নামে তাহার দোকানদারিকে আমি ঘৃণা করি ! কী ! সংসারের ক্রীতদাসেরা কি বলিতেছে, তাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিবে ! ছিঃ ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না। বেদ বলে, সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ, কারণ তিনি গির্জা ধর্মমত, ঋষি (prophet), শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না। মিশনারীই হোক বা অপর কেহই হোক, তাহারা যথাসাধ্য চিৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না।···"

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিবেকানন্দ চার কন্যার কাছে ছিলেন এক স্নেহশীল ভ্রাতা। তাই প্রয়োজনবোধে তিরস্কারের পরেই তাঁর স্নেহ যেন ঝর্ণাধারার মতোই নেমে আসত চার কন্যার ওপরে। মেরী হেলের ক্ষেত্রেও তাই হল (আমরা জানি, মেরী হেলকেই স্বামীজী সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন এবং তাঁকেই স্বামীজীর চিঠির সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি), যে-মুহূর্তে তিনি বুঝলেন ভগিনী মেরী হেলের প্রতি কিছুটা কঠোর ভাব দেখিয়েছেন, তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তখনই আবার লেখেন একটি চিঠি। তবে এবার আর গদ্যে নয়, তাঁর হৃদয়-উৎসারিত স্নেহপ্রবাহ ছোট্ট একটি কবিতাতেই যেন আপন-পথ খুঁজে পায়। তারই কয়েক পংক্তি—

"Now Sister Mary
You need not be sorry
For the hard raps I gave you,
You know full well,

Though you like me tell,
With my whole heart I love you."

এমন স্নেহপ্রবণ ভাইয়ের সঙ্গে কি রাগারাগি করা যায়? নাকি অভিমানভরে বেশি দিন চুপ করে থাকা যায়? কবিতায় স্বামীজীর চিঠি পেয়ে মেরী হেলের রাগও মুহূর্তে জল হয়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর জবাব লিখতে বসেন কবিতাতেই লেখেন—

"One day he sat and mused alone
Sudden a light around him shone.
The 'still small voice' thoughts inspire
And his words glow like coals of fire.
And coals of fire they proved to be,
Heaped on the head of contrite me—
My scolding letter I deplore
And beg forgiveness o'er and o'er."

(Vide 'Swami Vivekananda in the West by Marie Louise Burke)

এমন সুনিবিড় স্নেহপ্রীতির বন্ধন ছেড়েও একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে চলে আসতে হয় দেশের টানে, তাঁর জাতির স্বার্থেই—নিদ্রিত ভারতাত্মাকে জাগাবার জন্য স্বামীজীর সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা আজ সকলেরই জানা। কিন্তু দেশে ফিরেও বিবেকানন্দ সেই চার কন্যাকে কোনদিনই ভোলেননি, তাঁদের সঙ্গে আবার মিলিত হবার ইচ্ছা সব সময়েই চিঠিপত্রে জানিয়েছেন। কিন্তু এর পর তিনি আর মাত্র কয়েক বৎসরই ধরাধামে ছিলেন। বড় আকস্মিকভাবেই তিনি এ পৃথিবীর প্রিয়জনদের মায়া কাটিয়ে বাঞ্ছিতলোকে প্রস্থান করেন। স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা ও তাঁর ভাবাশ্রিতা চার কন্যা বা ভগিনীদের হৃদয়ে সেই বিয়োগব্যথা যে কী নিদারুণ হয়েই বেজেছিল, তা স্বামীজীর দেহত্যাগের কয়েক দিন পরেই মিস্ মেরী হেলকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানা যায়। স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করেন বেলুড় মঠে, ৪ জুলাই, ১৯০২। নিবেদিতা তখন থাকতেন কলকাতার বাগবাজারে। সেই মর্মান্তিক সংবাদ পেয়েই তিনি বেলুড় মঠে চলে আসেন। ক'দিন পরে (১০ জুলাই) মেরী হেলকে লেখেন—

"My dear dear Mary,

After all these two years, I repoen our correspondence to tell all of you something about the sad news which has

already reached you. You have heard of Swamiji's death on Friday evening last, the 4th of July, at 9·· He left everything in order. Everything at peace and in the moment of his greatest strength, quietly, of his own will, he left us.

"I have scarcely a touch of sorrow—so great seems to me the victory—so pure—so flawless. Swamiji is ours today as he has never been. The poor tortured body is released. We are only begining to know the sweetness of the Great and will beyond. I dare not say any more—for knowing how you loved him, I fear by any word to give you pain · " (vide, Letters of Sister Nivedita, collected and edited by Sankari Prasad Basu).

ভগিনী নিবেদিতার সেই অশ্রুসজল চিঠির উত্তরে চার কন্যারা কী লিখেছিলেন জানি না, হয়ত তাঁদের চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া সে চিঠি নিবেদিতাও সবটা পড়তে পারেননি।

ভারতের স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতা

তিনি জন্মেছিলেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের আলস্টারে ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭-তে এক ধর্মযাজকের (পাদরী) ঘর আলো করে। সেই ধর্মযাজক-বাবা হলেন স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল আর মা ইসাবেল নোব্‌ল। এক ভাই, দু' বোন, মাকে আদর করে ডাকতেন 'ছোট্ট মা'। সেই ছোট্ট মায়ের আদরের মেয়েটিই হলেন মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল। এবং তিনিই পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয়া ভগিনী ও লোকমাতা নিবেদিতা।

মার্গারেট ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। শৈশব পেরিয়ে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণেই তাঁর প্রতিভার প্রকাশ। সেইসময়েই পিতা দেহরক্ষা করেন। ভাইবোনদের মধ্যে বড় ছিলেন মার্গারেট, তাই জীবিকার উপায় তাঁকেই বেছে নিতে হয়। ভরণপোষণের জন্য ছোট একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল চালাতেন। অবসর সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতেন, আলোচনা করতেন, লিখতেন ধর্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা-প্রভৃতি বিষয়ে। বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি সেইসময় পরিচিত হয়ে উঠেছেন, সাংবাদিকতায় তাঁর সুনাম ছড়িয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিজের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে নির্ভীক মতামত প্রকাশের জন্য। আর সেই সুবাদে দার্শনিক বার্নাড শ', বৈজ্ঞানিক টি. এইচ. হাক্সলে ও কবি ইয়েটসের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছে আর রাজনীতির অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে সাহস ও দৃঢ়তা দরকার তা তিনি অর্জন করেছিলেন রাশিয়ার খ্যাতনামা বৈপ্লবিক নেতা প্রিন্স ক্রপটকিনের লেখা পড়ে ও তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসে।

নিজের দেশে এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভাব সত্ত্বেও মার্গারেট সেখানে 'ঘর বাঁধতে' পারলেন না, কারণ তাঁর জীবন ছিল দৈব-নির্দিষ্ট। অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, অসীম সাহস আর সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিসীম মায়ামমতা তাঁকে কোন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে পারল না। কোন মহৎ কাজে আত্মাহুতি দেবার জন্য তাঁর অন্তরাত্মা ছটফট করত সবসময়।

সে-সুযোগও তাঁর এসে গেল ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে এক ভারতীয় যোগীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। মার্গারেটের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কারো কাছে মাথা নোয়াবেন না। কিন্তু সেই ভারতীয় যোগীর ব্যক্তিত্বে, প্রতিভায়, পবিত্রতায় মুগ্ধ মার্গারেটের সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে তাঁর পায়ে নতজানু হলেন এবং তাঁকেই গুরু ও আদর্শ বলে মেনে নিলেন। বলা বাহুল্য সে যোগী

হলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। আর গুরুও চিনতে পেরেছিলেন মার্গারেটকে উচ্চ আধাররূপে। স্বামীজী আহ্বান করলেন তাঁকে ভারতবর্ষের কাজে।

সন্ন্যাসীর সেই আহ্বানে এমনি এক স্বর্গীয় শান্তি ও পবিত্রতা নিহিত ছিল যা উপেক্ষা করার সাধ্য মার্গারেটের ছিল না যদিও নিজের দেশ, ছোট্ট মা, ভাইবোন আর অগণিত বন্ধু-বান্ধবদের স্নেহ-প্রীতির বন্ধন কাটাতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল এবং সময় লেগেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তাঁকে ভারতবর্ষে চলে আসার জন্য কোন জোর করেননি, তাঁকে অনেক সময় দিয়েছিলেন ভেবে দেখার জন্য।

মার্গারেট ভারতবর্ষে এলেন ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে। কলকাতা বন্দরের জাহাজঘাটে স্বয়ং স্বামীজী এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। স্বামীজী ছাড়া সবাই অপরিচিত এখানে। অপরিচিত দেশ, অপরিচিত মানুষজন। কিন্তু অচিরেই মার্গারেট তাঁর গুরু স্বামীজীর মতোই আর এক আপনজনের সাক্ষাৎ পেলেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী তথা বিশ্বজননী সারদাদেবী যাঁর সান্নিধ্যে এসে মার্গারেট সাতসমুদ্র-তের নদীর পারে ফেলে আসা তাঁর বড় আপন 'ছোট্ট মায়ের' অভাব অনেকটা ভুলতে পারলেন।

সবার ওপরে 'ভারতমাতা' মার্গারেটের জন্য যেন কোল পেতেই ছিলেন। গুরুর আদেশে মার্গারেট তাঁরই সেবায় লেগে গেলেন ভারতে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই। গুরু তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিবেদন করলেন ভারতমাতার কাজে, তাই নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। ভার পড়ল তাঁর ওপরে দেশের মেয়েদের শিক্ষিত করবার। শিক্ষা-ছাড়া কোন জাতি জাগে না, মেয়েদের সুশিক্ষিত করতে না পারলে তাঁরা সুসন্তানের জননী হতে পারবেন কেমন করে? অবশ্য স্বামীজী এখনকার ইংরেজি-ফ্যাশানের শিক্ষা চাননি। বলতেন—"যেরকম শিক্ষা চলিতেছে, সেরকম নহে। সত্যিকার কিছু শেখা চাই। খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না, যাহাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা নিজেরাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে।... পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করিতে হইবে। কালে যাহাতে তাহারা ভালো গিন্নী তৈয়ারী হয়, তাহাই করিতে হইবে। এই সকল মেয়েদের সন্তান-সন্ততিগণ পরে ঐ সকল বিষয়ে আরও উন্নতিলাভ

করিতে পারিবে। যাহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাহাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।"

গুরুর আদেশে ভগিনী নিবেদিতা মেয়েদের জন্য এমনি একটি বিদ্যালয় খুললেন কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে। রক্ষণশীল সব হিন্দু বাড়ি ঘুরে ঘুরে তিনি ছোটবড় সব মেয়ে সংগ্রহ করে আনতেন। তাঁদের পড়াতেন, গান শেখাতেন, সেলাই ঘরকন্নার কাজ সব কিছুরই হাতে খড়ি হত নিবেদিতার কাছে। দিনরাত খাটতেন বিদ্যালয়টির জন্য—সেই ঐতিহ্যবাহী স্কুলটিই আজ 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে খ্যাত। সেই সময় স্বামীজীর আর এক শিষ্যা সিস্টার ক্রিষ্টিনও নিবেদিতার কাজে সহায়তা করার জন্য এসেছিলেন।

কিন্তু নিবেদিতার ছুটি নেই, মাঝে মাঝেই তাঁকে স্বামীজীর কথায় এখানে-ওখানে বক্তৃতা করতে হয়, আলোচ্য বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ ও বই লেখার কাজও চলে সেই সঙ্গে। লেখেন—'কালী দি মাদার', 'ওয়েব অফ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'ক্রেডেল টেলস্ অফ হিন্দুইজম্' প্রভৃতি। একবার কালীঘাট মন্দিরে মা কালীর বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে ঝড তোলেন।

ইতিমধ্যে নিবেদিতার কলকাতা তথা ভারতের বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ-চন্দ্রের মতো মানুষেরাও নিবেদিতার গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সঙ্গে ভারতের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—নিবেদিতার তখন এই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। ভারতের উন্নতি চাই কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—এসব বিষয়েই অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। কবির কাছে নিবেদিতা, তখন আর ভগিনী নন, 'লোকমাতা'—সর্বগ্রাসী ভালোবাসা তাঁর। সে ভালোবাসায় শক্তি যোগায়, ভারতবর্ষকে চিনতে শেখায় একান্তভাবে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও নিবেদিতার সান্নিধ্যে এসে একইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, বলতেন—"তাঁর (নিবেদিতার) কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।" একদা হতাশ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রও নিবেদিতার সান্নিধ্য ও সাহচর্যে এসে আবার বিজ্ঞানসাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন এবং নিবেদিতার সে-ঋণ জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পত্নী লেডি অবলা বসু পরিশোধ করেছিলেন নানা ভাবেই শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায়।

এ-দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নিবেদিতা যেমন অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রভৃতিকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন এবং সেই সূত্রে জাপানী শিল্পী ওকাকুরার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতেন। ওকাকুরা-লিখিত বিখ্যাত পুস্তক 'আইডিয়ালস্ অফ দি ইস্ট'-তেও নিবেদিতার অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পী নন্দলাল বসুকে নিজের খরচায় নিবেদিতা অজন্তায়

পাঠিয়েছিলেন বিখ্যাত বিদেশী শিল্পী মিসেস্ হেরিংহামের সহকারী হিসাবে। ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও নিবেদিতার সঙ্গে এই আন্দোলনের সামিল হন 'ইণ্ডিয়ান আর্টের' ওপর মনোজ্ঞ রচনাদি প্রকাশ করে। নিবেদিতাও লিখতেন রামানন্দবাবুর আগ্রহে ও অনুরোধে। এই সময় নিবেদিতার সঙ্গে আরও একজন সম্পাদকের ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি হলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক এস. কে. র‍্যাটক্লিফ। মিঃ র‍্যাটক্লিফ নিবেদিতার এতই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, এক সময়ে স্বনামে ও বেনামে নিবেদিতার অনেক উগ্র জাতীয়তাবাদী লেখাও প্রকাশ করতেন ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে। কেবল প্রবন্ধ লিখেই নয়, নিবেদিতা একই সঙ্গে বিভিন্ন জনের কাছে অজস্র চিঠি-পত্র লিখে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গৌরব ঘোষণা করতেন এবং সেইসঙ্গে ব্রিটিশ-শাসনের অকল্যাণকর দিকগুলিও তুলে ধরতেন। সম্প্রতি নিবেদিতার সেইসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে দু'খণ্ডে প্রখ্যাত গবেষক ও সাহিত্যিক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসুর সম্পাদনায় 'লেটারস্ অফ সিস্টার নিবেদিতা' নামে। (কেবল জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনকারী বিষয়-হিসাবেই নয়, নিবেদিতার ব্যক্তিগত চিঠিগুলিও নিঃসন্দেহে পত্রসাহিত্যে ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত।) অবশ্য এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এইসব স্বনামধন্য ব্যক্তি ও তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতা বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরে।

এতদিন সবই যেন চলছিল ঠিকঠাক, হঠাৎ গুরু দেহ রাখলেন। নিবেদিতার জীবনতরী মাঝদরিয়ায় এসে হঠাৎ কর্ণধার-বিহীন হয়ে গেল। কিন্তু নিবেদিতার যে অনেক কাজ বাকী তখনও, গুরু তাঁর ওপর অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে গেছেন। গুরুর অদর্শনে নিবেদিতা ক্ষণিকের জন্য দমে গেলেও ভেঙ্গে পড়লেন না।

এইসময় নিবেদিতার জীবনতরী হঠাৎ অন্যপথে বাঁক নিল। তিনি যেন হঠাৎই উপলব্ধি করলেন ভারতমাতা যতদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন এদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হবে না। তাই সর্বাগ্রে স্বাধীনতা চাই। দেশের শিল্প সংস্কৃতিতে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাণপ্রবাহ ফিরিয়ে আনতে হলে ভারতকে মুক্ত করতে হবে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে।

নিবেদিতার কথায় ও কাজে ছিল দেশপ্রেমের আগুন। সে আগুনের ফুল্‌কি যেদিকেই পড়ে সেদিকেই লেলিহান হয়ে ওঠে যেন তার শিখা। যুবকসমাজের অন্তরে নিবেদিতা দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়, জাতীয়তাবাদের নামে সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে, শ্লোগান ছিল—"এক জাতি এক প্রাণ একতা।" শ্রীঅরবিন্দ তাই নিবেদিতাকে বলতেন— "শিখাময়ী"।

দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের একটা ঢেউ এসেছে। শ্রীঅরবিন্দ, গোখেল, বিপিন পাল প্রভৃতির মতো নেতা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝেই কর্মধারা নিয়ে মতান্তর দেখা দিত। এমন বিরোধের ফলেই "নরমপন্থী" ও "চরমপন্থী" দলের সৃষ্টি হল। নিবেদিতার চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় এই নেতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কিছুটা কমলেও শেষ রক্ষা হয়নি। আর নিবেদিতাও স্বয়ং ইংরেজ শাসকের সঙ্গে কোন আপস মীমাংসায় আসতে চাইতেন না। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—এ বিষয়ে তাঁর কণ্ঠ সবসময়ে চড়া সুরেই বাঁধা থাকত। এবং সেই সূত্রে 'ডন সোসাইটি' (সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত) ও 'অনুশীলন সমিতির' বিপ্লবীরা নিবেদিতার একান্ত আপনজন হয়ে উঠলেন, তিনি তাঁদের সাহস ও শক্তি যোগাতেন নিজের জীবন বিপন্ন করেও। সতীশচন্দ্রের 'ডন' পত্রিকাটিও নিবেদিতার বিপ্লব প্রচারের একটি মাধ্যম ছিল। এইসময় নিবেদিতা বাস্তবিকই হয়ে উঠেছিলেন যেন অগ্নিশিখা বা 'শিখাময়ী'। সেই 'আগুনের পরশমণির' ছোঁয়ায় অর্থাৎ নিবেদিতার সাহচর্যে, শিক্ষায় ও নির্ভীক উক্তিতে দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ তথা ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে বিপ্লবাগ্নি সহজেই জ্বলে উঠত।

দুর্দান্ত বড়লাট লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী মনোভাবকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না, এদেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে কার্জনের উন্নাসিকতা ও তাঁর 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন'কে তীব্র ধিক্কার দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'পচনশীল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন লাঞ্ছনা ও গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় উপেক্ষা করেও।

ভগিনী নিবেদিতা জানতেন তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। দেহত্যাগের আগে তাঁর বড়ই সাধ ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে যাওয়ার আর সাধ ছিল স্বাধীনতার প্রথম দিনটিতে তিনিই বইবেন স্বাধীন ভারতের পতাকা। সে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি অকাল মৃত্যুতে। তবে মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ প্রণতি, তাঁর প্রাণের অর্ঘটি তিনি ঠিকই নিবেদন করে গেছেন তাঁর গুরু ও আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের পায়ে। স্বামীজীকে নিয়ে লেখা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'The Master as I saw him' ('স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' নামে স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত) তাঁর হৃদয় উজাড় করা সেই নৈবেদ্য।

নিবেদিতা মাত্র ৪৪ বছর বেঁচেছিলেন। ভারতে এসেছিলেন ১৮৯৮-এর জানুয়ারিতে। দেহত্যাগ করেছিলেন দার্জিলিং-এ ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর। এই ১২/১৩ বছর কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না করেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য। দুঃখের বিষয়, অনন্য প্রতিভা, শক্তি, সাহস ও ভারতপ্রেমের এই প্রজ্বলন্ত শিখাটি স্মরণে-মননে-গবেষণায় অনির্বাণ রাখার দায়দায়িত্ব যতটা আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষ কিন্তু ততটা গ্রহণ করায় এখনও উদ্যোগী হয়ে ওঠেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা

॥ ১ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়! দিতে হয় সব কিছু তাকে। আকাশ বাতাস তাই পূজায় পূজায় পূর্ণ। সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে, মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন—আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি। সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এ সব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতোই তাঁর সঙ্গ—বিশেষত যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!"

এই উদ্ধৃতিটুকু করা হল ভগিনী নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি অবশ্য লেখা ইংরেজিতে—লিখেছিলেন তাঁরই এক প্রিয় বান্ধবীকে। শুধু একটি নয়, এমনি অজস্রধারায় চিঠি লিখে গেছেন নিবেদিতা তাঁর প্রিয়জনদের। তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে বুঝতে হলে এইসব চিঠিপত্র অপরিহার্য। বাঙালি বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র থেকে শুরু করে জাপানী শিল্পী ওকাকুরা কেউ বাদ পড়েননি—সকলেরই কীর্তিকথা তাঁর অপূর্ব বচন-ভঙ্গীতে ছড়িয়ে দিতেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁরই প্রিয়জনদের কাছে। আর তার মানস-সায়রে প্রেমভক্তির যে অজস্র ফুল ফুটত, তাও তিনি কথার মালায় গেঁথে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদ্দেশে সেই অর্ঘটি নিবেদন করতেন। তিনি বাস্তবিকই নিবেদিতা ভগবচ্চরণে। তিনি তো সব কিছুই দিয়েছিলেন তাঁর, কিন্তু পেয়েছিলেন বোধ করি আরও বেশি। তবে এ পাওয়া বাইরের কিছু নয় অর্থাৎ এ পাওয়া ধন-জন-যৌবন নয়—এ পাওয়া তাঁর অন্তরের—তাঁরই আত্মার সৌন্দর্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পূজায় তিনি নিজেই একটি ফুল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। অবশ্য পশ্চিম দুনিয়া থেকে স্বামী বিবেকানন্দই এই ফুলটি এনেছিলেন, কিন্তু ফুটে ওঠার গৌরব তাঁর নিজের। নিবেদিতার চিঠিপত্রগুলি তাঁর সেই ফুটে-ওঠা অন্তরাত্মারই সৌরভ বহন করে নিয়ে যেত তাঁর প্রিয়জনদের কাছে। আমরা এ-ও জানি, নিবেদিতা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত বলেই মনে করতেন। বলতেন—"আমাদের মধ্যে একটি আত্মাই বিরাজমান, যার নাম—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'। তাই নিজেকে ভাবতেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দেরই নিবেদিতা (Nivedita of Ramakrishna-Vivekananda)।

ভগিনী নিবেদিতার বহু চিঠিপত্র এখনো অপ্রকাশিত। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতার সেই সব অপ্রকাশিত চিঠিপত্র সঙ্কলন ও প্রকাশের

ব্যাপারে সুলেখক এবং গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর উদ্যম খুবই উল্লেখযোগ্য। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্রাবলীর (ইংরেজীতে) এক বৃহৎ অংশ মুদ্রিত হয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো কোন এক সময় সে-সবের বাংলা অনুবাদও আমরা দেখতে পাব। যাই হোক নিবেদিতার সমস্ত চিঠিপত্র প্রকাশিত হলে ভাষাশৈলী ও ভাবমাধুর্যের বিচারে বিশ্বের পত্রসাহিত্যে হয়ত তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারে—নিবেদিতার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অনুরাগীদের এমন ধারণাও নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

নিবেদিতার তুলনা নিবেদিতাই। তাঁর অন্তরের ভাবভক্তির কথা না হয় ছেড়েও দিলাম, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষায় লালিতপালিত হয়েও কোন বিদেশিনী নারীর ভারতবর্ষ ও তার মানুষের জন্য এইভাবে নিঃশেষে আত্মবিলয়ের আর কোন নজির এর আগে ছিল কি?

ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন শক্তি ও সাহসেরই প্রতিমূর্তি। স্বামীজীর পর স্বল্পকালের জন্য হলেও পরাধীন ভারতের বিভ্রান্ত যুবসমাজের কাছে তিনিই পেরেছিলেন ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যটি তুলে ধরতে। যুবকগণকে বলতেন—"উপনিষদ বেদান্ত গীতা এরাই আমাদের শিক্ষাদাতা। আমাদের নিজের ভাবনাকে ছাপিয়ে পরদেশী ভাবনাকে আমল দিও না। আমাদের ধর্মবোধ আর আচার-ব্যবহারের মাঝে ভেজাল ঢুকিও না।"

এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ ভারত—'এক জাতি এক প্রাণ একতা'ই ছিল নিবেদিতার ধ্যান-জ্ঞান। সেই প্রেরণাতেই তিনি দেশমাতৃকার বেদীমূলে ভারতের যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, দৃপ্তভাবে তাদের ডেকে বলতেন—"হয় স্বীকার করতে হবে অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব আছে, নয়তো বলতে হবে আমাদের একতা কোনদিন ছিল না বা হবে না।

"ভারতের অখণ্ডতা নেই, কাউকে একথা মুখে আনতে দেবে না। যারা বলে আমরা দুর্বল, আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন সহায়সম্বলহীন পরাধীন হতভাগ্য আমরা, তাদের দেশহিতৈষণার ভাঁওতায় ভুলো না।" তাঁর নিজের ভাষায়—"We see that India is one, and she is one and shall be one. This thought with the note of joy and strength, is the duty of every nationalist to hold."

এইভাবেই ভারতের সেবায় যুবসমাজকে নিবেদিতা শক্তি ও সাহস যোগাতেন। কখনও তিনি তাদের নিয়ে মেতে উঠতেন ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্প-সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, কখনো বা তিনি মুখরিত হয়ে উঠতেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের জয়গানে। তাঁর সেই উৎসাহ-উদ্দীপনাতেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে উঠলেন তাঁর একান্ত আপনজন। নিবেদিতার

ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ; বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও। একজন তাঁকে আখ্যা দিলেন 'লোকমাতা', আর একজন বললেন 'মহাশ্বেতা',। সেই তিনিই আবার বিপ্লবীদের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বেলে হলেন 'শিখাময়ী'—এই নাম শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের প্রতি ভগিনী নিবেদিতা আকৃষ্ট হয়েছিলেন মুখ্যত স্বামী বিবেকানন্দেরই কারণে। স্বামীজী বিদেশে হিন্দুধর্ম প্রচারে না গেলে নিবেদিতার এ দেশে আসা হত না—এ কথা নিবেদিতারই। এদেশে এসে কিন্তু বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষও নিবেদিতার ধ্যানের বস্তু হয়ে উঠল। ভারতবর্ষকে কেমন করে ভালবাসতে হবে তা স্বামীজীই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজীর মুখে প্রায়ই শোনা যেত—"বিদেশে আসবার আগে ভারতকে আমি ভালবাসতাম, আর এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার কাছে অমৃত···।" সেই সময়েই নিবেদিতা একদিন স্বামীজীর কাছে শুনেছিলেন—"ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য যোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দু মেয়ের অন্তর শিশুরই মতো আধফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সবল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য। ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শরক্ষার জন্য প্রাণপণে যুঝতে তারা জানে। এই গুণে সতীর তেজ আজও তাদের মাঝে অম্লান হয়ে জ্বলছে···।" নিবেদিতা যেন সেইদিনই বুঝলেন, এই আহ্বান বুঝিবা তাঁকেই উপলক্ষ করে। হ্যাঁ, স্বামীজী নিবেদিতাকেই চেয়েছিলেন আর চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জন্যই। চেয়েছিলেন একজন অসীম সাহসী নারীকে—স্বামীজীর ভাষায় 'সিংহী'কে—যে ভারতের কাজে সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত থাকবে। নিঃসন্দেহে নিবেদিতাই ছিলেন সেই শক্তিময়ী নারী—যাঁর কেল্টিক রক্তে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা—বক্ষে যাঁর দুর্জয় সাহস—হৃদয়ে অসীম মায়া মমতা আর বুদ্ধি ও প্রতিভায় যিনি অনন্যা—পরবর্তীকালে যে স্বীকৃতি তাঁর মিলেছিল ভারতেরই সেরা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিক মহল থেকে।

ভগিনী নিবেদিতা (তখন মিস্ মার্গারেট নোবল) ভারতবর্ষে এসে স্বামীজীর কথায় প্রথমেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন স্ত্রী-শিক্ষার কাজে। আজ 'সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল' নামে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের যে বিখ্যাত বিদ্যালয়টি, ভাবতে অবাক লাগে তার গোড়াপত্তন কিন্তু করে গিয়েছিলেন স্বয়ং নিবেদিতাই মাত্র তিনটি অনাথ ছাত্রী নিয়ে। নিবেদিতা

অবশ্য বিদ্যালয়টির নাম রেখেছিলেন 'বালিকা বিদ্যালয়'। কেমন ছিল বাগবাজারের অপরিচ্ছন্ন সেই গলিতে নিবেদিতার বিদ্যালয়টি? আকর্ষণীয় সেখানে কিছুই ছিল না, একমাত্র নিবেদিতা ছাড়া! ছাত্রীদের যেমন পাড়া প্রতিবেশীরও সেরকম অজস্র ও অদম্য কৌতূহল নিবেদিতার সম্বন্ধে। নিবেদিতার ধরন-ধারণ সবই যেন রূপকথার রাজকুমারীদের মতো। ছাত্রীদের পড়াতেন রামায়ণ-মহাভারত, ভারতের বীর যোদ্ধাদের কথা বলতে বলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত নিবেদিতার। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা শিক্ষিতা হবে প্রাচীন ভারতের আদর্শে—যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী—সেই পথ ধরেই ভারতীয় নারী-সমাজের জড়ত্ব মোচন করতে হবে। ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত যে সামান্য শিক্ষা ব্যবস্থা মেয়েদের জন্য প্রচলিত হয়েছিল তার প্রায় সবটাই ছিল বিলিতি ঢং-এ। স্বামীজীর দূরদর্শিতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ থেকে ভারতীয় নারী সমাজকে রক্ষা করতে স্বামীজী নিয়োগ করলেন একজন পাশ্চাত্যের নারীকেই—যিনি শেখাবেন কিনা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ! এ যেন ঠিক কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতোই ব্যবস্থা। সেই সময় একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নিবেদিতার মতবিরোধ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের মেয়ের ইংরেজি শিক্ষার ভার নিতে বলেছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা রাজি হননি। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনে নিজ অভিরুচির চেয়ে অপত্য-স্নেহই প্রাধান্য পেয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে সে যুগের কথা পর্যালোচনা করলে রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা মোটেই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নয়। কাজেই নিজ সন্তানের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে নিবেদিতাকে তিনি ঠিকই নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা তখন ভারতীয় সত্তায় এমনই ওতপ্রোত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এ প্রস্তাব মানা খুবই কষ্টকর ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেদিন, নিবেদিতা কিন্তু অচিরেই রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি সুনিপুণভাবে অনুবাদ করে কবিগুরুর প্রতি তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা-প্রীতির নিদর্শন দেখিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের অবলা-দুর্বলা নারীজাতির সুপ্ত শক্তিকে স্বামীজী জাগাতে চেয়েছিলেন এই নিবেদিতার মধ্য দিয়েই। নিবেদিতাকে বোঝাতেন— "পাঁচশ" পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ' নারীর দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা করা যেতে পারে।" পরবর্তীকালে (অবশ্যই স্বামীজীর দেহত্যাগের পর) যখন নিবেদিতা রাজনীতিক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁর অন্তরের তাগিদেই, তখনই স্বামীজীর সে কথা যেন সত্যে পরিণত হয়েছে। নিবেদিতা সে সময় একাই যেন পাঁচশ' নারীর শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ, গোখলে প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে নিবেদিতা কেবল শক্তিময়ী নন—তিনি ছিলেন "শিখাময়ী"—পথ দেখিয়েছিলেন তাঁদের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগিনী নিবেদিতাই একদা পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন. যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সেকথা আজ বিস্মৃত হওয়ার মুখে (সৌভাগ্যের কথা, প্রখ্যাত গবেষক-লেখক অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় "নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন" নামে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধের মাধ্যমে অনেক বিস্মৃত ও অবলুপ্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন)। কিন্তু যেদিন লেখা হবে নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সেদিন ভগিনী নিবেদিতার নামও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে দেখা যাবে।

ভগিনী নিবেদিতাও জানতেন, ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবেই। কিন্তু ভারতের সেই মরণ-পণ মুক্তি সংগ্রামে একটি সাধ নিবেদিতার পূর্ণ হয়নি তাঁর অকাল মৃত্যুতে। তিনি চেয়েছিলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত এই স্বাধীনতার প্রথম দিনটি তিনি তাঁর সর্বসত্তা দিয়ে উপভোগ করবেন। চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা বহন করে সেদিন তিনি চলবেন সবার আগে আগে আর আকাশ বাতাস ভরিয়ে দেবেন তাঁর অতি প্রিয় সেই শ্লোগানে—

"ওয়াহ গুরু কী ফতহ! বন্দেমাতরম্!!"

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শিখাময়ী নিবেদিতাই আবার ভারতকল্যাণ তথা মানবকল্যাণের জন্য 'লোকমাতা' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই তাঁকে এই আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন তাঁর কল্যাণময়ী ও মমতাময়ী রূপটি দেখে। দেখেছিলেন দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে নিবেদিতা ছুটে গেছেন আর্তজনের পাশে, নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে কবি তাঁর স্মৃতিচারণায় নিবেদিতার সেই মমতাময়ী রূপটিই তুলে ধরেন—"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাইরে একটি সমগ্র দেশের ওপর ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগিত না।"

তাই আজও মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা ছিলেন সত্যই প্রেমময়ী ভারত-প্রতিমা। ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় সমাজে, বিশেষত নারীসমাজে, আজও অনন্যা। তাঁর আত্মত্যাগ ছিল দধীচির মতোই—নিজের সব ক'টি অস্থির বিনিময়েই যেন নতুন ভারতের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছিলেন। কবিগুরুর মতো শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও নিবেদিতার সেই

মহিমময়ী রূপটি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে 'মহাশ্বেতা' বলে অভিহিত করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে নিবেদিতাব ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথাও অবনীন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ-চিত্তে উল্লেখ করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় ("জোড়াসাঁকোর ধারে") লিখেছেন "ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। বাগবাজারের ছোট্ট ঘরটিতে তিনি থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। (শিল্পী) নন্দলালদের কত ভালবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে। একদিন আমায় নিবেদিতা বললেন, অজন্তায় (বিখ্যাত মহিলা চিত্রশিল্পী) মিসেস হেরিংহাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দু'পক্ষেরই উপকার হবে।..."

"নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কী চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।"

বিজ্ঞান-সাধক আচার্য জগদীশচন্দ্রও সারাজীবন ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করেছেন তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার মধ্য দিয়েই। নিবেদিতা বসু-দম্পতির কাছে ছিলেন 'হৈমবতী উমা'র মতোই 'ঘরের মেয়ে'। 'ঘর' বলতে কোন নির্দিষ্ট বাসগৃহের কথা কিন্তু বোঝাননি বসু-দম্পতি। সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল নিবেদিতার আবাস-ভূমি।

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস, এক আকৃতি আর এক সম্প্রীতি হতেই জাতীয় একতার উদ্ভব হয়।"

একথা নিবেদিতারই।

নিবেদিতার তুলনা নিবেদিতাই

"এইখানে সমাহিত আছেন ভগিনী নিবেদিতা যিনি তাঁর সব কিছু ভারতকে দিয়ে গেছেন।"

দার্জিলিং শহরে ভগিনী নিবেদিতার সমাধি-মন্দিরে এই কটি কথা উৎকীর্ণ আছে। "তাঁর সব কিছু ভারতকে দিয়ে গেছেন"—তাঁর এইসব কিছু দেওয়ার পরিমাপ কী আজ পর্যন্ত হয়েছে অথবা তা কী হওয়া সম্ভব? (দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয়, নিবেদিতাকে স্বাধীন ভারতবর্ষ এখন পর্যন্ত অল্পই চিনেছে অথবা চেনবার চেষ্টা করেছে।) অবশ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (যিনি স্বয়ং নিবেদিতার সাহচর্যে এসেছিলেন) মাত্র কয়েকটি কথায় নিবেদিতার একটি অনবদ্য মূল্যায়ন করে গেছেন, বলেছেন—"ভগিনী নিবেদিতা দেশের (ভারতবর্ষের) মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমনকি জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন সত্য, অত্যন্ত সত্য করিয়া, নিকট করিয়া জানিবার শক্তিলাভ করি নাই।"

নিবেদিতার এই হৃদয়-উজাড় করা সবকিছু দেওয়ার শুরু ভারতের নারী-প্রগতি তথা স্ত্রী-শিক্ষার মধ্যে আর শেষ পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য তাঁর। অক্লান্ত পরিশ্রম বা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত মোক্ষণ করাতে এবং তারই ফলে অকালে তাঁর দেহত্যাগ হয় মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। নিবেদিতার এই আত্মত্যাগের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে, অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন, অনশন করিয়াছেন. তিনি (কলকাতার বাগবাজারের) গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার বা বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই।......

"ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন, সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের

অন্তর কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?"

ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় ও মুক্তি সাধনায় সতী নিবেদিতার এই আত্মত্যাগ যে ব্যর্থ হয়নি, স্বাধীন ভারতবর্ষে বসে আজ সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু বর্তমান নারী প্রগতির জোয়ারে নিবেদিতার নাম ভেসে গেল কেন ? তবে কী এই ধরণের স্ত্রী-শিক্ষা বা নারী-প্রগতি নিবেদিতার কাম্য ছিল না ? তবে তারও আজ বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। 'প্রগতি' নামের রঙিন চশমা পড়ে যদি আমাদের নারীসমাজ দুর্গতির পথে পা বাড়িয়ে থাকেন সেখানেও তাকে সজাগ-সচেতন করবার সময় এসেছে। আবার নিবেদিতা তাঁর সাধনায় বা কর্মপ্রেরণায় যে বৈষম্যহীন ও একতাবদ্ধ স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপ দিতে চেয়েছিলেন, বাস্তবে স্বার্থদ্বন্দ্বের সংঘাতে নিবেদিতার সেই ধ্যানের ভারতবর্ষ যথার্থই কী রূপ পরিগ্রহ করেছে বহুবাঞ্ছিত সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ? এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি আজ আদর্শ-চ্যুতি ঘটে থাকে তবে তারও মোকাবিলায় আজ নিবেদিতার মূল্যায়ন হওয়া দরকার যাঁর আদর্শের জীয়ন-কাঠিটি কখনোই মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল স্পর্শ করেনি। কিরকম ছিল নিবেদিতা আদর্শের জীয়ন-কাঠিটি ? সম্প্রতি প্রখ্যাত গবেষক—লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার ৮০২টি চিঠিপত্রের এক সংকলন গ্রন্থ বের করেছেন দু'খণ্ডে 'লেটার্স অব সিস্টার নিবেদিতা, নামে যা পাঠ করলে শিহরণ লাগে এই ভেবে যে, বর্তমানের সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা নৈতিক অবক্ষয় রোধেও নিবেদিতার এক একটি চিঠি যেন জীয়ন-কাঠির মতোই প্রাণবন্ত ও বলপ্রদ। এইসব চিঠিপত্রগুলির মধ্যে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসু আবার দেখেছেন নিবেদিতার পূর্ণ প্রস্ফুটিত অন্তর সত্তাটিকে। তাঁর মতে "নিবেদিতা কত গভীরভাবে ভারতকে ভালবেসেছিলেন, এই দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, ভারতের সার্বিক কল্যাণ, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও তাকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কতখানি ব্যাকুল হয়েছিলেন, তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের তীক্ষ্ণ সমালোচনা, বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সমকালীন বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন —

"একদল ডাকাত ভারত আক্রমণ করে ভারতভূমি ধ্বংস করছে। ডাকাতরা কী শেখাতে পারে ? ভারতকে তাদের বিতারণ করতেই হবে।"

আবার ১৯০১ সালে কার্জনকে "ভয়াবহ, আত্মসন্তুষ্ট,উচ্চাভিলাষী" ভাইসরয় রূপে সমালোচনা করে লিখেছেন, "কবে এক হাতে গীতা আর এক হাতে তরবারি নিয়ে মাতৃভূমি জাগবে ?"

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, নিবেদিতার শক্তি বা প্রতিভার মূল্যায়ন করতে হলে একযোগে স্বামী বিবেকানন্দকেও চিন্তা করতে হবে অথবা স্বামীজীকে বাদ দিয়ে নিবেদিতার সঠিক মূল্যায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, বিবেকানন্দকে যদি সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে নিবেদিতাকে বলতে হয় 'অগ্নি'—যে অগ্নিশিখা (ঋষি অরবিন্দ নিবেদিতাকে সবসময় 'শিখাময়ী' রূপেই কল্পনা করতেন) 'বিবেকানন্দ-সূর্য' থেকে জ্বলে উঠে আপন শক্তি ও প্রতিভায় কেবল ভারতের শিল্পী-কবি—সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের চমৎকৃত করেনি, ভারতের লুপ্ত শিল্প-সংস্কৃতিকেও আলোকিত করেছে সেই সঙ্গে। আর সেই আগুনের পরশমণির ছোঁয়াতেই একদা বিপ্লবীরা মেতে উঠেছিলেনপরাধীন ভারতমা তার দুঃখমোচণে। ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগের পরে প্রখ্যাত জননেতা ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ অকুণ্ঠিতভাবেই বলেছিলেন—"If we are conscious of a budding national life at the present day, it is to a great extent due to the teaching of Sister Nivedita." ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসুও নিবেদিতার চিঠিপত্রের মধ্যে তাঁর উগ্র জাতীয়তাবোধের মানসিকতার সন্ধান পেয়েছেন কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, ভারতের প্রাচীন শিল্পচেতনাতেও নিবেদিতা ছিলেন অনন্যা। ঐতিহাসিকের মতে "ভারতীয় শিল্পকলার উজ্জীবন তাঁর (নিবেদিতার) কতখানি আকাঙ্ক্ষিত ছিল এবং বিষয়টির ওপর কতখানি গুরুত্ব তিনি দিতেন তার প্রমাণ রয়েছে বহু চিঠিতে। লিখেছেন যে, সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও শিল্পের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে। শিল্পের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাসের অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। ১৯০৫-এর ২৬ শে জানুয়ারি এক চিঠিতে লিখেছেন, জাতীয় শিল্পের পুনর্জন্ম আমার প্রিয়তম স্বপ্ন। ভারত যখন তার প্রাচীন শিল্প ফিরে পাবে তখন সে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবে।"

ভগিনী নিবেদিতার অন্তর-সত্তাটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল বহুদল কমলের মতোই—তার সৌরভ সহজেই যেমন ছড়িয়ে পড়ত শৌর্যে-বীর্যে-ভারতপ্রেমে, আবার ঈশ্বর-আরাধনায় ভাব-ভক্তির উপচার হিসাবে তা অমলিন ছিল চিরকাল। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে। সর্বক্ষণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'—এই পরিচয়ই তাঁর আত্মতৃপ্তির কারণ ছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ চিঠিতে সে-ভাবত ফুটে উঠত আকর্ষণীয়ভাবে. যেমন, "শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু—শিশু ভগবান। শিশুর কাছে কেউ কিছু চায়। দিতে হয় সব কিছু তাকে। আকাশ বাতাস তাই পূজায় পূজায় পূর্ণ! সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজছে, মধু! মধু! জীবন কর্মহীন, অর্থহীন—আঃ ভাবতেও অসীম শান্তি! সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর-এসব কিছুই যেন আমাদের

শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতোই তাঁর সঙ্গ, বিশেষতঃ যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!!" (স্বামীজীর শিষ্যা মিসেস ওলি বুলকে ৫ মার্চ, ১৯০৫-এ লিখিত নিবেদিতার চিঠি)। স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণকে স্মরণ করে প্রিয় বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে (ইনিও ছিলেন বিবেকানন্দ শিষ্যা) লিখছেন (৪ জুলাই, ১৯০৯)—

"মহাবেদনার সপ্তম স্মৃতি-বার্ষিকীতে তোমার জন্য দু'এক কথা: যিনি ছিলেন বুদ্ধ এবং শঙ্কর, না, প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্বে যিনি আলোক স্বরূপ—তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমরা পড়ে আছি মাটিতে। কিন্তু তাঁর থেকে আমরা তো বিচ্ছিন্ন নই, কারণ তিনি দেহবস্ত্র ত্যাগ করেছেন [এখানে নিবেদিতার 'গীতার' শ্লোকই মনে জেগেছে, যথা—বাসাংসি জীর্ণানি ইত্যাদি] কিন্তু হারাননি কিছু—আমাদের দৃষ্টি শুধু বিভ্রান্ত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য। সাতটি বছর—ধ্বনিময়—যেন তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। তুমি যে উত্তীর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সেই আলোককে অনির্বাণ রাখতে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়েছ। সে আলোক জ্বলুক, জ্বলুক বাতায়নে যেখানে তুমি তাকে স্থাপন করেছ, অনন্তকালের জন্য।"

ভগিনী নিবেদিতার বীর্যময় ব্যক্তিত্ব, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও মাধুর্যময় অন্তর-সত্তাটিকে স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের চেনাবার জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত গবেষক ও ঐতিহাসিকদেরই। স্বাধীন ভারতের কৃষ্টিক্ষেত্রে এক স্বর্ণখনিই উন্মোচিত হয়েছে নিবেদিতার চিঠিপত্র প্রকাশের মাধ্যমে যেকথা বলতে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসু একটুও দ্বিধা প্রকাশ করেনি। তিনি তার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই ভগিনী নিবেদিতার চিঠিপত্রগুলি যাচাই করে দেখেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন—"নিবেদিতার চিঠিগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে স্বর্ণখনি বলে বিবেচিত হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের শেষ কয়েক বছরের ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য 'ট্রানসফার অব পাওয়ার' ('ক্ষমতা হস্তান্তর') নামক গ্রন্থে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই আকর গ্রন্থ না পড়ে ঐ সময়ের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত ভগিনী নিবেদিতার এই চিঠিগুলিকে "ট্রানস্‌মিসন অব পাওয়ার" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে অসাধারণ প্রেরণা জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেতে নিবেদিতা সঞ্চার করেছিলেন তার প্রমাণ বহন করছে এই চিঠিগুলি। ঐ যুগের ইতিহাস রচনায় নিবেদিতার চিঠিপত্রের মূল্য অপরিসীম। শঙ্করী প্রসাদ বসু চিঠিগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশ করে ইতিহাস রচনা ও পুনর্মূল্যায়নের এক নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন ঐতিহাসিকদের।"

সবশেষে বলি, নিবেদিতার তুলনা নিবেদিতাই। তিনি অনন্যা। তিনি মহিমময়ী। নিবেদিতার কর্মময় জীবন ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা তাঁর

সমকালীন বিদগ্ধ সমাজের নিরিখেই পর্যালোচনা করা উচিত। কারণ আধুনিক নারী-প্রগতির চালুনীতে ছাঁকতে গেলে নিবেদিতার কোন স্বরূপই ফুটে উঠবে না ('দেবী বা মানবী' বিশেষণও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তিনি যথার্থই ছিলেন 'শিখাময়ী'—'আলোকদূতী')। এই প্রগতির উৎকট 'ফ্যাসানে' রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা বা সতী নিবেদিতা দাঁড়াতে পারবেন না ঠিকই, কিন্তু যেসময়ে নিবেদিতা ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যেন অমর্ত্যলোকের এক 'আলোক-দূতী'র মতোই পরাধীন ভারতবাসীর মোহঘুম ভাঙাবার জন্য এবং যাঁরা সেসময় এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু তাঁদের জীবতকালে নিবেদিতাকে তাঁদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপাচার বা অর্ঘ্যটি দিতে কোন ভাবেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। আমি রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, নন্দলাল প্রভৃতি এমন সব মানুষের কথাই বলছি। এঁদের কারো কাছে নিবেদিতা ছিলেন 'লোকমাতা,' কারো কাছে বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার 'আলোকদূতী' (এ লেডি অব দ্যা ল্যাম্প') কারো কাছে বা 'হৈমবতী' উমা, কারো কাছে 'মহাশ্বেতা,' 'শিখাময়ী' প্রভৃতি এমন বহু নামেই তাঁরা নিবেদিতার আলোকোজ্জল সত্তাটিকে চিহ্নিত করে গেছেন। এমন দ্বিধাহীন স্বীকৃতি যিনি সেকালে পেয়েছিলেন, আধুনিক কালের কোন সমালোচকের এমন কোন কষ্টি-পাথর আছে কী যাতে নিবেদিতার সেই মহত্ত্বকে খর্ব করা সম্ভব হবে? সমকালীন কবিকণ্ঠেও যে স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন তারই বা মূল্য কী কম?

> "দেহ রাখি' শৈলমূলে ; শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী,
> ওগো দেবতার দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী।"
>
> —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতপ্রেমে পাগলিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা সেবার বরোদায় এসেছেন কংগ্রেস অধিবেশনে। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষও তখন সেখানে। বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় নিবেদিতার অভ্যর্থনার যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলেন। স্টেশনে রাজকর্মচারীদের পাঠিয়ে-ছিলেন নিবেদিতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে, অরবিন্দও এসেছিলেন। অরবিন্দ নিবেদিতার পরিচিত, কিন্তু রাজকর্মচারীরা নিবেদিতার ধরন-ধারণ দেখে হতাশ, এবং যথেষ্ট বিরক্তও। স্টেশন থেকে গাড়ি করে নিবেদিতাকে নিয়ে তাঁরা শহরে প্রবেশ করলে তিনি বরোদা কলেজের গম্বুজওয়ালা ইংরেজ-স্থাপত্যের নিদর্শন দেখে বলে উঠলেন—"What an ugly pile" (অর্থাৎ "ম্যাগো!" কি জঘন্য!) কিন্তু ভারতীয়দের নিজস্ব ঢং-এ তৈরি গৃহস্থদের ছোট-ছোট বাড়িগুলি দেখে নিবেদিতা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন—"Oh! How beautiful!" কী সুন্দর! কী সুন্দর! সঙ্গী এক রাজকর্মচারী এবার আর থাকতে না পেরে অরবিন্দের কানে-কানে বললেন—"আরে! ভদ্রমহিলা পাগল নাকি?" ("I say, she is mad!")।

অরবিন্দ হাসলেন। তিনি জানতেন, নিবেদিতার এই পাগলামির কারণ, তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ ও ঐকান্তিক ভারত-প্রীতি। নিবেদিতা সত্যিই সেসময়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ভারতপ্রেমে—ভারতের স্বাধীনতার জন্য। তাঁর কাছে ভারতের সব কিছুই সুন্দর। কলকাতার বাগবাজারে ইস্কুল খুলেছেন মেয়েদের জন্য। তাঁদের পড়াচ্ছেন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী। শোনাচ্ছেন কোন ভিন্ দেশীয় উপকথা নয়, ভারত ইতিহাসেরই বীর জোয়ানদের কথা— শিবাজী, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের অদম্য সাহসিকতার কথা। বাংলার ব্রতকথা পাল-পার্বন সবকিছুতেই নিবেদিতার প্রবল উৎসাহ। ছবি-আঁকা, সেলাই-ফোঁড়াই সবকিছুই শিখিয়েছেন তিনি মেয়েদের নিজহাতে। সরস্বতী পুজোর সময় শাড়ি পরে খালি পায়ে মেয়েদের নিয়ে পুজো দেখতেন ঘুরে ঘুরে, অঞ্জলি দিতেন, প্রসাদ নিতেন। মেমসাহেবের এ-হেন আচরণ দেখে বাংলার গৃহস্থ কুলবধূরাও অবাক হয়ে যেত।

ভারতবর্ষ নামটি নিবেদিতার কাছে জপমালার মতোই হয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলের মেয়েদেরও বলতেন—"তোমরা সবসময় জপ করবে ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!—অন্য কিছু নয়।"

কোন ভাবপ্রবণ যুবক হয়ত এসেছে নিবেদিতার স্বরূপ না জেনেই। নিবেদিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন—"এখানে এসেছ কেন?"

—"বাঁচার মতো বাঁচতে চাই ···জগৎ ভুলতে চাই··"

"উঁহু, জগৎ ভুললে চলবে না, ওটা ঠিক রাস্তা নয়।"

ভাবুক ছেলেটি এবার জোর দিয়ে বলে—"আমি শুধু ভগবানকে চাই।"

ততোধিক জোর দিয়ে নিবেদিতা বলেন—"কর্মের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়, এ-জীবন তো তাঁরই খেলা। ভারতবর্ষের আজ সবাইকে বড় প্রয়োজন। আমার সঙ্গে এস, আমি শিখিয়ে দেব কেমন করে ভারতবর্ষকে ভালবাসতে হবে···"

নিবেদিতা তখন যুবকদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন ভারতপ্রেমে। অরবিন্দ, বারীন্দ্র, গোখলের মতো বিপ্লবীরা তখন নিবেদিতার একান্ত অনুগামী। এরা ছাড়াও শত শত যুবক তখন নিবেদিতার কথায় দেশের জন্য কিছু একটা করতে চায়। নিবেদিতাও চান যেভাবে হোক এদের সবাইকে ভারত-মাতার কাজে লাগাতে। নিজেও তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে রণরঙ্গিনী 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়েই কাল কাটাচ্ছেন। প্রগল্‌ভ যুবকদের ধমকাতেন এই বলে—অস্ত্র ধরতে জান? গুলি, ছুঁড়তে? জান না? তবে যাও, শিখে এস গিয়ে। আর একবার নিবেদিতার ভাষণে অনুপ্রাণিত যুবকেরা বক্তাকে অভিনন্দন জানায় এই ধ্বনি দিয়ে—'হিপ। হিপ! হুররে!' মুহূর্তে নিবেদিতা তাদের এই উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে বেশ ধমক দিয়ে বলেন—"বিদেশী জিগির দিয়ে মনোভাব প্রকাশ করো, এতই কী দো-আঁশলা হয়ে গেছ তোমরা? বল আমার সঙ্গে 'ওয়াহ্‌ গুরুজী কী ফতে'!"

ভারতপ্রেমে নিবেদিতা একদিকে যেমন পাগলিনী, অন্যদিকে তেমনি অগ্নিময়ী হয়ে উঠেছেন। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নয়, তাদের ভারত ছেড়ে চলে যেতেই হবে। অরবিন্দ নিবেদিতাকে বলতেন—'শিখাময়ী'। সেই 'আগুনের পরশমণির ছোঁয়াতেই' যুবকরা তখন তেতে উঠেছে। কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে যুবসমাজের ক্যাপামির মর্ম তখন অনেকেই অনুধাবন করতে পারেননি। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও সংশয় ছিল এ-বিষয়ে। তিনি নিবেদিতাকে স্পষ্টই বলেছিলেন—"তোমার বিশ্বাস আছে, শক্তি আছে। তুমি হিংসাত্মক বিপ্লবের কথা বলতে পার, কিন্তু তোমার চারদিকে যে যুবকদল এসে জুটেছে তাদের বিশ্বাসও নেই, শক্তিও নেই। তারা হাতের কাছে যেমন তেমন একটা কাজ চায় মাত্র। তুমি না থাকলে তারা কিছুই করতে পারবে না।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হয়ত ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু নিবেদিতার তখন অবসর ছিল না সেকথা যাচাই করার, স্বল্পকাল মধ্যে নিবেদিতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই সেই যুবকদলের মধ্য থেকে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, কানাই দত্ত প্রভৃতির আবির্ভাব দেখে সেই রবীন্দ্রনাথই আবার বিস্মিত না হয়ে পারেননি। সেসময়ের ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী

যুবকগণের ওপর বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আজ অনস্বীকার্য। স্বামীজী যেমন যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জেলে দিয়েছিলেন, নির্ভীকভাবে বলেছিলেন—"আগামী পঞ্চাশ বছর এই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমার আরাধ্যা দেবী হন···" [এখানে স্মরণীয় বিবেকানন্দের এই উক্তির পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।] নিবেদিতাও সেইরকম যুবকদের সাহস যোগাতেন এই বলে—"তোমাদের আরাধ্যা দেবী ভারতমাতা। মন্দিরের বেদিতে ফুল-পাতা সাজিয়ে আর ধূপধুনা জ্বালিয়ে তাকে পাবে না···" অথবা "যারা বলে আমরা দুর্বল, আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সহায়সম্বলহীন পরাধীন হতভাগা আমরা, তাদের দেশহিতৈষণার ভাঁওতায় ভুলো না। যে-প্রাণ নবীন, যে-প্রাণ দুর্ধর্ষ, প্রকাশের নতুন নতুন পথ সে খুঁজবেই।"

নিবেদিতা যুবসমাজের শক্তির উৎস-মুখ খুলে দিয়েছিলেন কেবল স্বাধীনতা-আন্দোলনে নয়, ভারতের লুপ্ত শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের অন্যতম প্রেরণাদাত্রীও নিবেদিতা। অবনীন্দ্রনাথেরই কথা—"তাঁর (নিবেদিতার) কাছে গেলে মনে বল পাওয়া যেত।" নিবেদিতারই প্রেরণায় ও অর্থানুকূল্যে নন্দলাল বসু অজন্তায় গিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পের (গুহা-চিত্রের) পাঠোদ্ধার করতে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কার্যেও নিবেদিতার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা ছিল স্বতস্ফূর্ত।

এমন সর্বতোমুখী ভারতপ্রেম ও তার ধ্যান ধারণায় নিবেদিতা আজও অতুলনীয়া। পাগলের মতোই তিনি বারবার ছুটে গেছেন হিমালয়ে অন্তরের তাগিদেই, হিমালয়ের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শুনেছেন ভারতাত্মার চিরন্তন বাণী, হিমালয়ের পবিত্র ধূলি ললাটে ধারণ করে অনুভব করেছেন হিমালয়-অধীশ্বর সর্বত্যাগী মহেশ্বরের কৃপাস্পর্শ। নিবেদিতার এই হিমালয়-প্রেম ও ক্ষ্যাপামিও অনেকের দুর্বোধ্য মনে হত। দেহত্যাগের আগে শেষবার জগদীশচন্দ্র ও তাঁর ভাইপো অরবিন্দ বসুকে নিয়ে হিমালয়ে গেছেন কেদারনাথ-বদরীনাথ দর্শনমানসে। সারা পথই নিবেদিতা ভাব ও আবেগে তন্ময়। সঙ্গী দু'জন বিজ্ঞানমনস্ক, যদিও জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার অন্তর্জগতের খবর রাখতেন, কিন্তু অরবিন্দ বসু নিবেদিতার এই ধরনের ভাবাবেগকে কুসংস্কার বলেই মনে করতেন। এবং নিবেদিতার মতো তেজস্বিনী মেয়ের এই ধরনের কুসংস্কার (পাগলামিরই নামান্তর) দেখে তিনি কম বিস্মিতও হতেন না। শেষে একদিন সকালে নিবেদিতার ললাটে বিভূতির তিলক-কাটা দেখে অরবিন্দ আর থাকতে না পেরে এমন কুসংস্কারের কারণ সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেললেন তাঁকে। নিবেদিতা কিন্তু সহজভাবে উত্তর দিলেন—"সকালে আমার সঙ্গে একদিন পথ চল দেখি, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করো না। প্রশ্ন নিরর্থক। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রীতির

দৃষ্টিতে আশেপাশের সবকিছু দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ, পথে যা-কিছু দেখবে সবই আত্মনিবেদনের একেকটি মুদ্রামাত্র। দেখছো না অখণ্ড-মণ্ডলাকারে পরমগুরু শিবই এখানকার অধীশ্বর? তাঁকে এখনো চেনোনি তুমি। এখন চিনতে চেয়ো না। আগে গুরু খুঁজে নাও, দিশারী হয়ে তিনিই জীবনের পথে ধাপে-ধাপে তোমায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন।…"

নিবেদিতা কিন্তু তাঁর পরমগুরু অখণ্ডমণ্ডলাকার মহেশ্বর শিবকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন তাঁর জাগতিক গুরু বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই। সেইজন্য দেখি ভারতবর্ষের জন্য নিজেকে তিল-তিল করে উৎসর্গ করে মহাযাত্রার সময় এই হিমালয়ের ক্রোড়েই (দার্জিলিং-এ) মাথা রেখে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা নিঃশেষে পরমগুরুর কাছে আত্মবিলয় করলেন এই বলে—"The boat is sinking, but I shall see the sun". অর্থাৎ 'দেহতরী ডুবছে বটে, কিন্তু আমি আবার সূর্য দেখব।"

কিন্তু না, নিবেদিতা হয়ত একথার মধ্য দিয়ে কেবল নিজেরই মুক্তি চাননি, চেয়েছিলেন ভারতেরও মুক্তিসূর্য দেখতে। কারণ দেহত্যাগের কিছুদিন আগে তাঁর মনে এই আকৃতিও জেগে উঠেছিল—ভারত যেদিন স্বাধীন হবে, সেই আনন্দ-উল্লাসের মিছিলে স্বাধীন-ভারতের পতাকাটি তিনিই বয়ে নিয়ে যাবেন সবার আগে আগে আর হৃদয় উজাড় করে হাঁক দেবেন—"ওয়াহ্ গুরুজী কী ফতে! বন্দেমাতরম্!"

ভারতপ্রেমে পাগলিনী নিবেদিতার এমন আত্মবিলয়ের আজও কোন তুলনা পাওয়া যায় কী?

কালীঘাটে নিবেদিতা

স্মরণীয় একটা ঘটনা বটে! কলিতীর্থ কালীঘাট মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছেন একটি বক্তৃতা-অনুষ্ঠানের। বক্তা—? যাঁর নাম ঘোষণা করা হল তাতে সকলেরই বিস্ময় ও কৌতূহল বেড়ে গেল।

সেই অভিনব ঘটনাটি হল ভগিনী নিবেদিতাকে কেন্দ্র করেই। একদিন একান্ন পীঠের অন্যতম এই জাগ্রত তীর্থক্ষেত্রে সে সময়কার মন্দির কর্তৃপক্ষ তথা গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা নিবেদিতার একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন মন্দির-প্রাঙ্গণেই। বিষয়—মা কালী। বিষয় তো নয়, যেন বিস্ফোরণ হল কলকাতার রক্ষণশীল সমাজে। ইউরোপাগত এক নারীর কাছে (তখনকার দৃষ্টিতে যিনি ম্লেচ্ছ তথা অচ্ছুৎ) শুনতে হবে কিনা মা কালীর কথা! তাও আবার কিনা কালীঘাটের মতো পবিত্র ক্ষেত্রে বসে! যে মন্দির-প্রাঙ্গণে বিধর্মীরা ঢুকতেই সাহস পায় না, সেখানে ম্লেচ্ছ এক নারীর মুখে শুনতে হবে হিন্দুধর্মের কথা, তাও আবার মা কালীকে নিয়ে! ব্যাপারটি এতই অভিনব যে তা আদৌ ঘটবে কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। কিন্তু সব সন্দেহের নিরসন করে সেই ঐতিহাসিক ব্যাপারটি ঘটল এবং নির্দিষ্ট দিনেই।

অবশ্য এর আগেও নিবেদিতার কালী-বিষয়ক আর একটি বক্তৃতা (এবং সেটিই প্রথম) কলকাতার রক্ষণশীল সমাজে ঝড় তুলেছিল! ঐ বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন কলকাতার 'অ্যালবার্ট হলে' ঐ বছরেই ১৩ ফেব্রুয়ারি। নিবেদিতার সেই বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করে ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার লেখেন—"আপনারা আজ অনুমানও করতে পারবেন না কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিবেদিতার বক্তৃতার বিষয় শুনে কি রকম আঁতকে উঠেছিলেন। কালী সম্বন্ধে তাঁদের অতীব স্থূল ধারণা তখন, কালীঘাট-মন্দির থেকে সেই ধারণার সৃষ্টি, কেন না সেখানেপ্রতিদিন শত শত পাঁঠাবলি হত এবং প্রাঙ্গণে মাংস-বিক্রয় হত কসাইখানার মতো। বিখ্যাত হোমিপ্যাথি ডাক্তার ও পণ্ডিত মহেন্দ্রলাল সরকার মনোজীবনে ছিলেন যুক্তিবাদী, অনেকটা নাস্তিকও বলা যায়, তিনি বলতেন, কারও কালীঘাটে যাওয়া এবং কালীদর্শন করা উচিত নয়। বাস্তবিক নিবেদিতার বক্তৃতার কোন সভাপতি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এন. এন. ঘোষ প্রথমে রাজি হয়ে পরে পিছিয়ে যান। নিবেদিতা অদম্য, তিনি বিনা সভাপতিতেই অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিলেন।"

অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার সেই প্রথম কালী বিষয়ে বক্তৃতা এবং তার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কথা নিবেদিতা স্বয়ং ১৫ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে লিখে জানান তাঁরই প্রিয় বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে—"ভাল কথা, আমার কালী-বক্তৃতা হল সোমবারে। অ্যালবার্ট হল ঠাসা। প্রিয় বৃদ্ধ ডাঃ সরকার (মহেন্দ্রলাল সরকার) আমার ও কালীর বিরুদ্ধে বললেন; তাঁর দুচোখ ভরা জল, ভারী মর্মস্পর্শী। [প্রকৃতপক্ষে, ডাঃ সরকার ক্ষেপে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আমরা এইসব কুসংস্কার দেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, আর তোমরা বিদেশীরা আবার সেইসব প্রচার করতে উঠে-পড়ে লেগেছ!"] এই সময় এক ক্ষ্যাপা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে নানা কথার সঙ্গে তাঁকে 'বুড়ো শয়তান' বলে সম্বোধন করলেন। তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, এ ঘটনার বিষয়ে যখনই ভাবি, হেসে বাঁচি না। স্বামীজী বক্তৃতায় মহাখুশী।…""

কালীঘাটে নিবেদিতার বক্তৃতার ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন্দির-কর্তৃপক্ষ নিবেদিতার ব্যাপারে খুবই উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আরও প্রশংসনীয় ব্যাপার, তাঁরা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকেই নিবেদিতার বক্তৃতা-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। স্বামীজী রাজি হননি বিশেষ কারণে। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে কালীঘাট মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রায় তিন হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন নিবেদিতার বক্তৃতা শুনতে এবং তখনকার দিনের কলকাতার দেশী-বিদেশী সব নামকরা পত্রিকাতে বক্তা ও বক্তৃতার বিষয় নিয়ে যথেষ্ট প্রশস্তিও হয়েছিল। নিবেদিতার বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, মন্দির কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে নিবেদিতার সেই বক্তৃতার কয়েক হাজার কপি মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। পুস্তিকাটির এক কপি আজও বেলুড় মঠের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। প্রচ্ছদে লিখিত আছে—

"KALI-WORSHIP"

A Lecture delivered by
Miss Margaret Noble
(Sister Nivedita of the Ramakrishna Mission)
At the KALI'S TEMPLE at KALIGHAT
on the 28th May, 1899
Published by
Haridas Haldar
Priest to His Highness the Maharaja of Jaipur
(Rajputanah) at the Kalighat Temple

ভগিনী নিবেদিতার কালী-সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা নিঃসন্দেহে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। তাই তাঁর প্রকাশও অভিনব হওয়াই স্বাভাবিক। বিবেকানন্দের মা কালী রুদ্রতেজের প্রতীক—ভয়ঙ্করী—মৃত্যুরূপা। নিবেদিতার মা কালীও তাই দীনাহীনা নন। নিবেদিতার চোখে "তিনি ভয়াল, ভয়ঙ্করী। তিনি উলঙ্গিনী। স্বামী-বক্ষে নৃত্যপরা। কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা। সদা নিহতদের তপ্ত রক্তপানে ব্যাদিত রসনা। খড়্গাধারিণী; নিক্ষিপ্ত অস্ত্রমধ্যে এবং ভূতপ্রেত পিশাচদলের মধ্যে বিরাজমানা। সর্বনাশা মেঘপুঞ্জের মতোই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। মুক্তকেশ ছড়িয়ে আছে পদতলে। হা-হা হাসিতে লজ্জা পায় বজ্রধ্বনি। তিনি স্বয়ং ত্রাস।"

এমন ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্তিকেই নিবেদিতা তাঁর ধ্যানাসনে বসিয়ে রাখেন আর কালী-সম্বন্ধে তাঁর মনে নিত্য নূতন ভাব জেগে ওঠে। কালীঘাট-বক্তৃতা প্রসঙ্গেই এক বান্ধবীকে লেখেন—"কালী সম্বন্ধে একটা নূতনভাব মনে জেগেছে। মায়ের পদতলে শায়িত শিবের ঢুলুঢুলু চোখ দু'টি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কি করে তাই দেখছিলাম। কালী ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়ালে রেখে সাক্ষীরূপে তিনি দেখছেন দেবাত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন চলছে, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্য? অর্থাৎ মানুষই কি দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলা-চাতুরীয় হাল্কা ওড়নায় ঢাকা।"

অতএব 'মাভৈঃ'! ভয়ঙ্করী কালী মানুষেরই ভয়ঙ্কর বাসনা-সৃষ্টি! বাসনামুক্ত মানবের কাছে এই মা নিত্যানন্দময়ী! বাসনার কালী সব ধুয়েমুছে গেলেই মায়ের নামে সব জ্বালা জুড়ায়, হৃদয়ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে। তাই নিবেদিতার কাছে বাসনার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হলে কালীর ভয়ঙ্করী রূপটিও অন্তর্হিত হয়।

নিবেদিতা বলেন—"মায়া মিথ্যা, কালী তারই প্রতীক। কালীকে যদি আদর্শ হিন্দু নারী করে চিত্রিত করা হত, তা হলে তিনি সত্য হয়ে উঠতেন। তাঁর অবাস্তবতা দৃশ্যমান করবার জন্য কালী নিজেই তাই করেছেন—তাঁকে আদর্শ না-নারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

"শিবকে পদতলে তিনি আবৃত করে আছেন, নাচছেন শিবের বুকে, অন্যের মনোযোগ টেনে এনেছেন নিজের ওপরে—যেমন মরীচিকা ঝলমল করে উঠে বিভ্রান্ত করে দৃষ্টিকে।

"তাই কালীকে ভেদ করে দৃষ্টি প্রেরণ করতে হবে; তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা, তাঁর উপাসনা ছাড়া গত্যন্তর কি? কোন বই যদি কেউ মুখস্থ করতে চায়, সে কি সাদা কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে?"

"তাই আসল সাধক, যিনি তাঁর ভিতর দেখে তাঁকে জেনেছেন, তিনি শান্তভাবে তাঁর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন; যেভাবে তিনি দেখান নিজেকে, সেভাবে তাকে না দেখে, দেখতে পেরেছেন আসল যা-তিনি, তাঁকে। ব্রহ্মের মধ্যেই তাঁর সত্য অস্তিত্ব, যেমন জাগ্রত 'আমি' থেকেই স্বপ্নের 'আমি' উদ্ভূত। কোন নির্দিষ্ট-কালে স্বপ্ন যতোই জীবন্ত সত্য বলে মনে হোক, জাগ্রত অবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। দ্রষ্টা বলেন, কালীকে যা মনে হয়, তা তিনি নন, যথার্থত কালী ও ব্রহ্ম এক। তিনি মোক্ষদায়িনী তারা, তিনি ব্রহ্মময়ী।"

কালীঘাট-বক্তৃতায় আত্মতৃপ্ত নিবেদিতা দু'দিন পরে (৩১ মে) আমেরিকায় তাঁর এক বান্ধবীকে (মিসেস ওলি বুল) লিখে জানান—"একেবারে কালীঘাটে গত রবিবারে বক্তৃতা করেছিলাম। যথার্থত আমি ছোটখাট একটি বৈদান্তিক বক্তৃতা করেছিলাম—তাতে আমিই অবাক।" ঐ তারিখেই আর এক প্রিয় বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখেন—"কালীঘাট ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর কিছু দাঁড়ায়নি। সমবেত পুরুষদের আকার খুবই মার্জিত।"

আগেই বলেছি, কালীঘাটের মন্দির কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন নিবেদিতার বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য। স্বামীজী রাজি হননি। সস্নেহে নিবেদিতাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "কালীঘাটের পুরোহিতরা তোমার ভাষণের সময় আমাকে সভাপতি করতে চেয়েছে। কিন্তু আমি যাব না। আমার আবেগ সামলাতে পারব না। আমাদের পরিবারের বহু পুরুষ ধরে আমরা শাক্ত, কালীঘাটের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র।"

স্বামীজী নিবেদিতার কালীঘাট-বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করতে যাননি ঠিকই, তবে নিবেদিতার সেই বক্তৃতার প্রস্তুতি-পর্বে তিনিই উৎসাহ ও উপাদান যুগিয়েছেন। আর এই সূত্রেই নিবেদিতার হস্তগত হয়েছে স্বামীজীর অধ্যাত্ম জীবনের একটি মহামূল্য দলিল যা নিবেদিতা ছাড়া কাউকেই তিনি ঘূণাক্ষরে প্রকাশ করেননি এবং তা সম্ভব হয়েছিল স্বামীজীর প্রতি তাঁর মানসকন্যার অবিচলিত শ্রদ্ধা-ভক্তির দাবিতেই।

ঘটনাটি হল—নিবেদিতা যখন তাঁর কালীঘাটের বক্তৃতা নিয়ে খুবই চিন্তিত, ঠিক সেই সময় অর্থাৎ বক্তৃতার আগের দিন সকালবেলায় (২৭ মে) স্বামীজী নিবেদিতার কাছে এসেছিলেন যেন অন্তর্যামী রূপেই। নিবেদিতা তাঁর বান্ধবীকে লিখেছেন—"কি বলব না বলব ভাবতে গিয়ে মনটা দমে যাচ্ছিল। স্বামীজী এসে আমায় উদ্ধার করলেন। একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে তিনি সেদিন কথা বলছিলেন। নিজের জীবনের একটা ছবি আস্তে আস্তে তুলে ধরলেন আমার সামনে, আমাকে সাহস দেবার জন্য। মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো, সে যে কঠিন কাজ…"

আগেও বলা হয়েছে নিবেদিতার কালী সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা তাঁর গুরুর কাছ

থেকেই প্রাপ্ত। সে দিক দিয়েও সেদিনের সেই ঘটনাটি খুবই অভিনব এবং তাৎপর্যপূর্ণ। গুরু তাঁর বৈদান্তিক—জীবন-মৃত্যু যাঁর পায়ের ভৃত্য—তিনি কেন নিজেকে মা কালীর পায়ে সঁপে দিলেন তা রহস্যাবৃত হয়েই থাকত যদি না স্বয়ং তিনি সে সম্বন্ধে নিবেদিতাকে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যেতেন—যে প্রগতিশীল বৈদান্তিক-মনোভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের স্বচ্ছন্দ বিচরণ—সেখানে মা কালীর দ্বৈত সত্তাকে কেন তিনি স্বীকার করলেন সে-রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হলেও কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য সেদিন নিবেদিতা উদ্ধার করেন স্বামীজীর মুখ থেকেই—যে স্বীকারোক্তি নিবেদিতার কাছে স্বামীজীর অধ্যাত্ম-জীবনের একটি মূল্যবান দলিল বলেই মনে হয়েছে।

স্বামীজী সেদিন 'কালীতত্ত্ব' বিষয়ে নিবেদিতাকে বোঝাতে গিয়ে বলেন—ওঃ! কালীকে ও কালী-ব্যাপারকে কী ঘৃণাই করতাম। ৬ বছর ধরে সেই লড়াই, কেননা কালীকে কিছুতে মানব না।

নিবেদিতা—কিন্তু এখন আপনি তাঁকে বিশেষভাবে মেনে নিয়েছেন। তাই না স্বামীজী?

স্বামীজী—মানতে বাধ্য হয়েছি। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজেও তিনি (মা) আমাকে চালিত করেন—আমার এই বিশ্বাসের কথা তুমি জানো। তিনি আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করান।

"তবু কত দিনের লড়াই। মানুষটিকে আমি ভালবাসতুম—তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।

নিবেদিতা—এত সুযোগ সত্ত্বেও যখন আপনিই এত দীর্ঘদিন সন্দেহ করেছেন, তখন ব্রাহ্মরা যে করবে তাতে আশ্চর্য কি?

স্বামীজী—হাঁ—ঠিক, কিন্তু তারা তাঁর মধ্যে ঐ সীমাহীন পবিত্রতা কখনোই দেখতে পায়নি, যা আমি দেখেছিলুম। আর সে ভালবাসার স্বাদও পায়নি।

নিবেদিতা—আমার কী মনে হয় জানেন, তাঁর বিরাটত্বই তাঁর ভালবাসাকে এমন দুশ্ছেদ্য করে তুলেছিল আপনার কাছে।

স্বামীজী—তাঁর বিরাটত্ব সম্বন্ধে বোধ কিন্তু তখন আমার মধ্যে জাগেনি। সেটা এল পরে, আত্মসমর্পণের পরে। তার আগে তাঁকে ক্ষ্যাপা শিশুর মতো ভাবতুম—সব সময়ে এই দেখছেন, সেই দেখছেন, দেবদেবী, কত কি! সেসব জিনিসকে ঘৃণা করতুম। কিন্তু তারপরে—এমন কি কালীকেও মেনে নিতে হল আমাকে।

এইবার সুযোগ বুঝে নিবেদিতা স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেন—কেন মেনে

নিতে হল, তা কি বলবেন না স্বামীজী? কিসে আপনার অত বিরোধিতা চূর্ণ হল?"

স্বামীজী—না—সে রহস্য আমার সঙ্গেই চলে যাবে (No, that will die with me।) সে সময়ে আমার দুর্ভাগ্যের চরম ;পিতার মৃত্যু ও নানা দুর্বিপাক ; 'মা' দেখলেন, এই সুযোগ—আমাকে গোলাম বানাবার, যার একেবারে মুখের কথা—'তোকে গোলাম করে রাখব'। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর হাতেই আমাকে তুলে দিলেন।—বিচিত্র, এরপর তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) মাত্র দু'বছর ছিলেন, আর তার বেশি সময় অসুখে ভুগেছিলেন। ৬ মাস যেতে না যেতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হল—সে উজ্জ্বলতা কোথায় চলে গেল!

"গুরু গোবিন্দ সিংহেরও [প্রকৃতপক্ষে গুরু নানক; নিবেদিতা ডায়েরী লেখার সময় অনবধানবশত গুরু গোবিন্দ সিংহ লিখেছিলেন এবং পরে তা তাঁর অন্য বইতে সংশোধন করেছিলেন] একই দশা হয়েছিল। তিনি সেই শিষ্যটির সন্ধান করছিলেন, যাকে নিজের শক্তি দিয়ে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে নিজ পরিবারের দাবিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। নিজ সন্তানদির কোন মূল্যই ছিল না তাঁর কাছে। সেই বালকটিকে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন— যাতে তাকে সব দিয়ে মরতে পারেন।

নিবেদিতা—শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সর্বদা কালীর অবতার মনে করি। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁকে কি তাই বলবে না?

স্বামীজী—হাঁ। এ বিষয়ে আমিও নিঃসন্দেহ যে, কালী রামকৃষ্ণের ওপর ভর করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না কোথাও একটা মহাশক্তি আছে, যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে— 'কালী' বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে। আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী —ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনই হয়। শরীরের অগণ্য কোষ-সমষ্টিতেই ব্যক্তির আকার—বহু মস্তিষ্ককেন্দ্র তৈরি করে অখণ্ড চৈতন্য—

নিবেদিতা—হাঁ, বৈচিত্র্যের মধ্যে নিত্য ঐক্য—

স্বামীজী—তাই তো! কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে বিভিন্নতার কারণ কি! ব্রহ্মই— অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—আবার দেবদেবীও—

"সুতরাং দেখছ, আমি ব্রহ্মে বিশ্বাসী, আবার দেবদেবীতে, কিন্তু আর কিছুতে নয়—"

স্বামী বিবেকানন্দের সংগ্রামী অধ্যাত্ম-জীবনের এই মহামূল্যবান তথ্য পেয়ে নিবেদিতা মহা উল্লসিত হয়ে উঠেন। কালীঘাট-বক্তৃতার দুর্ভাবনার মেঘ কাটাতে যেন স্বয়ং মা কালীই স্বামীজীকে পাঠিয়েছেন বলে নিবেদিতার সেই সুন্দর সকালে মনে হয়। সেদিন স্বামীজী নিবেদিতার কাছে ঘণ্টা দুয়েক

ছিলেন। তিনি চলে যেতেই নিবেদিতা বিপুল উৎসাহে কম্পিত-হস্তে বিবেকানন্দ-মুখ-নিঃসৃত সেই দেবদুর্লভ কথাগুলি লিখে রাখেন (শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত 'লেটার্স অব সিস্টার নিবেদিতা' দ্রষ্টব্য)। এবং পরের দিন সকালেই এই অভূতপূর্ব বার্তা পাঠান চিঠির মাধ্যমে আমেরিকায় তাঁর 'অভিন্ন-হৃদয় বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে, লেখেন—

"You are going to have such a treasure in this letter as you never received in your life. I am to lecture at the Kalighat this afternoon, and the Mother Herself sent Swami to me at 6 yesterday morning to talk."

চিঠির তারিখ ২৮ মে, সকালবেলা। অর্থাৎ নিবেদিতার কালীঘাট-বক্তৃতার প্রস্তুতি-পর্বের চরম উত্তেজনার মুহূর্ত সেসময়। কিন্তু তাতে উত্তেজনা থাকলেও দুর্ভাবনা ছিল না কিছুমাত্র, তা নিবেদিতার এই চিঠির বয়ান থেকেই বোঝা যায়। বরঞ্চ, সেই সকালে বিবেকানন্দের কালী-বিষয়ক গোপন তথ্যগুলি, যা আগের দিন তিনি স্বামীজীর মুখ থেকেই উদ্ধার করেছিলেন তাই পরম যত্ন ও আবেগে বান্ধবীকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এই বলে—"[গতকাল] স্বয়ং জগন্মাতা স্বামীজীকে পাঠিয়েছিলেন কথা বলতে। আমি একেবারে অথৈ জলে ছিলাম।···তিনি সেই সব-হারানো মনোভাব থেকে আমাকে বিরাট শক্তিতে তুলে ধরলেন—সেই সঙ্গে এমনই অপার্থিব পবিত্রতা এবং আমার প্রতি ঘনীভূত বিশ্বাস যে, সে কথা লিখতে যাওয়াও যেন অন্যায় মনে হচ্ছে। কিন্তু ভয় পাই, পাছে একটি কথাও হারিয়ে যায়। তোমাকে রেজিষ্ট্রি করে পাঠাচ্ছি। সারার [মিসেস্ ওলি বুল] কাছে পাঠাবার আগে তুমি কপি করে রাখবে।"

ঐদিন অর্থাৎ ২৮ মে'র সন্ধ্যায় নিবেদিতা তাঁর বাগবাজারের বাড়ি (১৬ নং বোসপাড়া লেন) থেকে ঠিক সময়েই কালীঘাট-মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। নিবেদিতার ফরাসী জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেঁম ঐদিনের কথায় লেখেন—"নিবেদিতা খালি পায়ে কালীঘাটে চললেন। স্বামী সদানন্দ সঙ্গে আছেন। দীর্ঘ পথ। মন্দিরের চারদিকে ভিখারীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভক্ত যাত্রীদের মন গলাতে চায়। ভিক্ষাপাত্রটা ঠন্-ঠন্ করে বাজায়। পুরোহিতরা ওদের দিনে একবার খেতে দেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে গোলপাতায় ছাওয়া বিরাট চালা। তার মধ্যে নানা রঙের ছড়াছড়ি—নীল, লাল, গোলাপী, বেগনী, সিঁদুরে নানা রঙের ফুলের সমারোহে মহাকালীর জয়ধ্বনি উঠছে যেন। পূজার্থীরা লাল চেলী বা তসর পরে প্রাঙ্গণে বসে আছে, কেউ-কেউ মণ্ডপের সিঁড়িতেও বসেছে।"

মন্দির-কর্তৃপক্ষ নিবেদিতার বক্তৃতার সব ব্যবস্থাই ইতিমধ্যে করে ফেলেছিলেন সুন্দরভাবে। আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি ছিল না। শুধু

একটি বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এবং তা আগেই জেনেছিলেন নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকেই। নিবেদিতার বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করার অনুরোধ তিনি রাখতে পারেনি, কিন্তু সেই বক্তৃতার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামীজীর কিছু বিশেষ নির্দেশ বা অনুরোধ ছিল মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে। স্বামীজী বলেছিলেন নিবেদিতাকে—"তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দৃঢ় নির্দেশ দিয়েছি। কোন চেয়ার থাকবে না। প্রত্যেককে মেঝের ওপরেবসতে হবে—মঞ্চের তলায় তোমার পায়ের নীচে। টুপি ও জুতো খুলে রাখতে হবে। যদি ইউরোপীয় বা ব্রাহ্ম কেউ উপস্থিত থাকেন, সেক্ষেত্রে ও জিনিস যাতে পালিত হয় স্বয়ং তোমাকে দেখতে হবে। তুমি বসবে সিঁড়িতে, কয়েকজন অতিথির সঙ্গে।"

ঠিক সেইভাবেই নিবেদিতা সেদিন ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছিলেন মন্দিরের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তাঁর শক্তিময়ী ও মাধুর্যময়ী মা যেন তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হলেন সেই সময়ে। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন এইভাবে—

"যে জায়গাটিতে আজ সন্ধ্যায় আমরা মিলেছি, এটি কালীর পবিত্রতম পীঠস্থান। যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত-প্রাণের প্রার্থনা, বেদনা ও কৃতজ্ঞতার পূজা নিবেদনের স্থান এটি, মৃত্যুক্ষণে শেষ চিন্তার লক্ষ্যস্থল। মা এখানে কত সাধককে দর্শন দিয়েছেন, তার নির্ণয় কে করবে? কেউ মায়ের সন্তান, কেউ তাঁর চিহ্নিত বীর। কেউ শুধু ভক্ত, তাঁর ভাব ও রূপসুধাপানে পাগল, আবার কেউ তাঁকে নিজ আত্মার স্বরূপজ্ঞান করেছেন। অনন্ত আত্মা, তাঁদের অনন্ত শক্তি, বাসনাও অনন্ত—যার তৃপ্তিসাধন মা করে থাকেন।

"এই স্থান থেকেই তরঙ্গিত হয় তাঁর স্বর, ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীতে, ঊষায় সন্ধ্যায় মৃদু মধুকণ্ঠে ডেকে বলে: শিশুরা, আমার শিশুরা, আমি—আমিও তোমাদের মা।"

"দিবস যখন প্রখর উজ্জ্বল, পৃথিবী কর্মশব্দে মুখর, তখন মায়ের কণ্ঠ হয়ত ডুবে যায়, কিন্তু আবার যখন শান্তিলগ্ন ঘনায়, নিজ অন্তরের মুখোমুখি হয়ে বসে মানুষেরা, তখন তারা যত পরিবর্তিত ভাবেই শুনুক না কেন, তবু বার্তা আসে, শান্ত ক্ষুদ্র সুরগুলি এত ক্ষুদ্র—এত সুন্দর যে, আমাদের কানে প্রায় পশেই না, যদিও একদিন আমরা অনুভব করবই যে বিশ্বের সবকিছু—জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা—কালীর অখণ্ড নিত্য সঙ্গীতের এক একটি সুর।"

এইভাবে ভাব ও আবেগ দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেও নিবেদিতা ক্রমশঃ 'কালীতত্ত্বের' গভীরে প্রবেশ করেন এবং মূর্তিপূজা, কালীমূর্তিকল্পনা ও বলিপ্রথা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেন। এখানে মনে রাখতে হবে, নিবেদিতার কালী-সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা কিন্তু আমাদের তন্ত্র-পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। নিবেদিতার কালী—তাঁর

মনোময়ী—তাঁরই অন্তরাত্মায় উদ্ভাসিত এবং দৃঢ় যুক্তিতেই তাঁর হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত। যেমন, মা কালীর অবয়ব সম্বন্ধে তিনি বলেন—"ভক্তের কাছে মায়ের মূর্তি কুৎসিত নয়। যে-মূর্তিটিকে তুমি তোমার বাল্যকাল থেকে ভালবেসেছ, ভক্তি করেছ, সে মূর্তি কি তোমার থেকে আলাদা কিছু যে, তার সামনে গোমড়ামুখে দাঁড়াবে নিন্দা বুকে পুরে! 'নিষ্ঠুর!' 'কুৎসিত!' 'অবাস্তব!' এসব উক্তি তো বিদেশীর। জীবন, অভিজ্ঞতা ও ভাবনা যা দেখতে দেয়, মানুষ ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে তাই দেখে। কোন খ্রীষ্টান কি বর্ণনানুযায়ী ছবিটা চোখের সামনে জাগিয়ে রাখে যখন সে গায়—রয়েছে উৎস, পূর্ণ রক্তে? (There is a fountain filled with blood)···

"কালীমূর্তি দেখে অভ্যস্ত এমন চোখেও ধরা পরে তার সুগভীর, সুতীব্র, চমকপ্রদ অর্থদ্যোতকতা। যে অভিযোগকারী ইউরোপীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেছেন, তিনি যদি ইউরোপীয় হতেন, তাহলে কালী মূর্তিকল্পনার বিষয়ে ঐ কথাও বলতেন। এখানে এইটুকু বলা যায়, নিজেদের পুরাণ-কথা, বা সৃষ্টি সম্বন্ধে ভারতীয়েরা পশ্চিম থেকে চোখ সরিয়ে তুলনাদি ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকলেই ভাল করবেন। মাতৃরূপের চিত্রণে নিজস্ব উপায় বজায় রেখে তাতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর্শবোধ সঞ্চারিত করাই তাঁদের পক্ষে উচিত কাজ হবে। তা করলেই তাঁরা যথার্থ জাতীয় এবং মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন। তা না করলে তাঁরা বিদেশী সৃষ্টির বহিরঙ্গ সৌন্দর্যটুকু দেখে বিভ্রান্ত হবেন, কদাপি ঐ সৌন্দর্যের পশ্চাদবর্তী গভীর প্রেরণা ও আদর্শের চরিত্র বুঝবেন না, এবং নিজেদের শিল্পকে ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন করতে গিয়ে আরও স্থূল ও নিম্নমুখী করে তুলবেন।"···

[অনূদিত]

কালীঘাট-মন্দিরের এই দীর্ঘ বক্তৃতাশেষে নিবেদিতা খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। এখানে বলা আবশ্যক, নিবেদিতার কালীঘাটের বক্তৃতা মূলতঃ কলকাতার 'অ্যালবার্ট হলে' তাঁর প্রদত্ত কালীবিষয়ক বক্তৃতার মিশ্র প্রতিক্রিয়ারই ফলস্বরূপ। কালীঘাটে তিনি 'অ্যালবার্ট হলে' উত্থিত আপত্তিগুলিকে সুনিপুণ যুক্তিতে খণ্ডন করে শ্রোতাদের দ্বারা প্রশংসিত হন। নিবেদিতার কালীঘাট-বক্তৃতার সাফল্যে আনন্দিত ও উল্লসিত হন এই মন্দিরের কর্তৃপক্ষও। জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে তাঁরা অবিলম্বে নিবেদিতার ঐ বক্তৃতার তিন হাজার কপি মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এবং বলা যায়, এই কালীঘাট বক্তৃতারই সার্থক ফলশ্রুতি এবং তাঁর কালী বিষয়ক ধ্যান-ধারণার মূর্তরূপ তাঁরই রচিত বিখ্যাত সেই গ্রন্থ 'কালী দি মাদার' যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকাতেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল।

অনন্যা নিবেদিতার অনন্য পত্রাবলী

ভগিনী নিবেদিতা চিঠি লিখতে ভালবাসতেন। তাঁর ৪৪ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে অজস্র চিঠি তিনি লিখেছেন অক্লান্তভাবে। সেইসব চিঠি প্রয়োজনে যতটা না লিখতেন, ভালবাসায় লিখতেন তার ঢের বেশি। প্রিয়জনদের কাছে লেখা তাঁর সেই ভালবাসায়-ভরা চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে ছিল দেশপ্রীতি তথা ভারত-প্রীতি আর ঈশ্বরপ্রীতিতেই ভরা। ব্যক্তিগত স্বার্থ-প্রীতির কোন নামগন্ধই নেই তাঁর কোন চিঠিপত্রে। কয়েক বছর হল নিবেদিতার সেইসব চিঠিপত্রের একটা বড় অংশ প্রকাশিত হয়েছে দু'খণ্ডে 'লেটার্স অব সিস্টার নিবেদিতা' নামে। সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক-লেখক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। চিঠিগুলি ভাব ও ভাষায় নিঃসন্দেহে 'ক্লাসিক' পর্যায়ভুক্ত করা যায়। চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম, বিশেষত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। ঐতিহাসিক নিমাইসাধন বসুর মতে—"নিবেদিতার চিঠিগুলি ঐতিহাসিকদের কাছে স্বর্ণখনি বলে বিবেচিত হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের শেষ কয়েক বছরের ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য 'ট্রানসফার অব পাওয়ার' ('ক্ষমতা হস্তান্তর') নামক গ্রন্থে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই আকর গ্রন্থ না পড়ে ঐ সময়ের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু সম্পাদিত ভগিনী নিবেদিতার এই চিঠিগুলিকে 'ট্রানস্মিশন অব পাওয়ার' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে অসাধারণ প্রেরণা জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নিবেদিতা সঞ্চার করেছিলেন তার প্রমাণ বহন করছে এই চিঠিগুলি। ঐ যুগের ইতিহাস রচনায় নিবেদিতার চিঠিপত্রের মূল্য অপরিসীম।"

আর এইসব তথ্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় চিঠিগুলিতে নিবেদিতার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সেইসব চিঠিতে কখনো তিনি উপদেষ্টা, কখনো তিনি স্নেহবৎসলা মাতা ও বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা, কখনো বা শত্রুপক্ষের কাছে আপসহীন রণচণ্ডীরূপে প্রকাশিতা। মনে পড়ে, নিবেদিতা যখন ভারতে এসে স্বামীজীকে একটি অনুষ্ঠানে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন তখন স্বামীজী ছোট্ট একটি কবিতায় তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তার শেষ দু'টি লাইন হল—

> "Be thou to India's future Son,
> The Mistress, Servant and Friend in One."

তাই মনে হয়, নিবেদিতা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়লে

বিবেকানন্দ-কথিত তাঁর সেই 'সেবিকা-বান্ধবী মাতা' রূপটি কখনোই চাক্ষুষ করা যেত না। তিনি না থাকলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত হয়ত অন্য খাতে প্রবাহিত হত। বিপ্লবীদের চরম সঙ্কটমূহূর্তে বহুবার সেই আন্দোলনের হাল অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রেখেছেন এবং বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী লেডি অবলা বসু নিবেদিতাকে মেনকা-নন্দিনী 'হৈমবতী-উমা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মর্ত্যলোকে উমাই তো অসুরদলনী স্নেহময়ী জননী—একাধারে নমনীয়তা-কমনীয়তা আবার প্রচণ্ড পৌরুষ ও শক্তির অভিব্যক্তি তিনি। নিবেদিতার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বও তাই। আমরা জানি তিনি কিভাবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে নিজের জীবন বিপন্ন করে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও রক্ষা করেছিলেন এবং অবধারিত ফাঁসি বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ্বের সময় উভয়দলকে সমঝোতায় আনতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রায় সমবয়সী মিঃ গোখলেকে অসীম মমতায় স্বমতে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। আবার অত্যাচারী কার্জন উইলি কিংবা "ভয়াবহ, আত্মসন্তুষ্ট, উচ্চাভিলাষী', লর্ড কার্জনের কার্যকলাপে ফুঁসে উঠেছেন এই বলে—'একদল ডাকাত ভারত আক্রমণ করে ভারতভূমি ধ্বংস করছে। ডাকাতরা কী শেখাতে পারে? ভারতকে তাদের বিতাড়ন করতেই হবে।" সেইসঙ্গে তাঁর আপসহীন রণহুঙ্কার—"কবে এক হাতে গীতা আর এক হাতে তরবারি নিয়ে মাতৃভূমি জাগবে?" এসব কথাই চিঠিপত্রে উল্লিখিত ও গবেষণার বিষয়। অনেকের ধারণা, পাঞ্জাবী যুবক মদনলাল ধিঙ্গড়া যে কার্জন উইলিকে হত্যা করেছিলেন তাতে নিবেদিতার পরোক্ষ অনুপ্রেরণাই কাজ করেছিল। বিপ্লবী ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল নিবেদিতার কথাকে মনে করতেন 'ডিনামাইট'। নিবেদিতার বহু চিঠি পড়ে মনে হয়, সত্যিই তা ছিল বিস্ফোরক 'ডিনামাইট'। তা বুঝে আশঙ্কিত ইংরেজ সরকার একসময় 'সেন্সর' করতে আরম্ভ করেছিল নিবেদিতার চিঠির। কিন্তু নিবেদিতা দমবার পাত্রী নন। একসময় তিনি 'Nealous' ছদ্মনাম নিয়েও সমানে তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। নিবেদিতার সাংবাদিক বন্ধু মিঃ র‍্যাটক্লিফের কাছে লিখিত চিঠিপত্রে তাঁর ভারতপ্রীতি ও ইংরেজ-বিদ্বেষ সমানভাবেই প্রকাশ পায়। রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ও পৃথিবীর ইতিহাসে 'mutual aid' মতবাদের স্রষ্টা প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের ভাবে অনুপ্রাণিতা নিবেদিতা বোমা তৈরি পর্যন্ত করতে শিখেছিলেন। আবার তিনি আইরিশ বিপ্লবী সিন্‌ফিন্‌দের 'টেকনিক' পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। কতগুলি চিঠিতে তাঁর অকুতোভয় রণরঙ্গিনী মূর্তিই প্রকটিত। তেমনি একটি—"আমাদের মৃত্যুভয় জয় করতেই হবে। কাপুরুষ বলে আমাদের যে অখ্যাতি তা আমরা ধুয়ে-মুছে ফেলব আমাদের শক্তি দ্বারাই।" যারা মৃত্যুভয়ে ভীত তাদের তিনি তফাৎ যেতে বললেন ভালয়-

ভালয়। পরাধীনতার বিষবৃক্ষ উৎপাটনে তখন তিনি নির্মম—অসুরদলনী-রণরঙ্গিণী।

প্রিয়জনদের মধ্যে মিস্ ম্যাকলাউডকেই নিবেদিতা চিঠি লিখেছিলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বের কথাও তিনি অসঙ্কোচে খুলে বলতেন। বিবেকানন্দ-নির্দেশিত 'নারী-তৈরি' বা নারী জাগরণের কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে কেন তিনি এভাবে বিপ্লব-আন্দোলনে বা রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাও তিনি খোলাখুলিভাবে চিঠিতে লিখেছেন তাঁর প্রিয় বান্ধবীকে। আসলে তিনি সে-সময় কেবল কয়েকটি মেয়েকে তৈরি করা বা শিক্ষিতা করার কাজেই নিজেকে নিঃশেষিত করতে চাননি। স্বামীজী সমগ্র ভারতে যে 'জাতীয় চেতনার' উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, পুরুষদের মতো সমস্ত নারী-সমাজেও সেই জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করাই সেসময় নিবেদিতা তাঁর মহত্তম কাজ বলে মনে করেছিলেন। বান্ধবীকে লিখেছেন—

"আমার কাজ জাতিকে জাগানো, কয়েকটি নারীকে প্রভাবিত করা নয়। একটি মানুষ [স্বামীজী] এসে আমাকে দেখিয়েছেন কিভাবে সেকাজ করতে পারি। তবে সেটা আমার তরবারিতে বাড়তি ধার দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। কারণ আগেই ও জিনিস আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

"হ্যাঁ, আমার কাজের কথা। আমি সফল নাও হতে পারি। আমি যেভাবে অনুভব করছি তুমি সেভাবে অনুভব করতে পারবে না—কদাপি ভাবতে পারবে না যে, কী অসম্ভব কাজ, আর কত না আমার অসামর্থ্য। কিন্তু তাতেই কী উল্টো ঘটবে—আমি কী কাজ ছেড়ে দেব? মাতৃ সমুদ্রে আমরা কি ঝাঁপ দিয়ে পড়ব না? কোনদিন তটে উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা, সে ব্যাপারটা কি মায়ের হাতে ছেড়ে দেব না?

"কেন তিনি [স্বামীজী] ঠিক এই সময়টিতে নিজেকে সরিয়ে নিলেন? তা কি প্রতিটি পরমাণু যাতে তাঁকে যন্ত্রণা না দিয়ে অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে পারে, সেইজন্য নয়? তাঁর জীবনপ্রবাহ যে বিরাট ভবিষ্যতের দিকে আমাদের চালিত করছে তাকে যাতে পেতে পারি, সেইজন্য কি নয়?"

কেবল রাজনীতিতে নয়, ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়েও 'জাতীয় চেতনা' তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। ১৯১০ সালে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলাল বসু নিবেদিতারই সাহায্যে এবং প্রেরণায় অজন্তায় গিয়েছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মিসেস্ হেরিংহামের সহকারী হয়ে। উদ্দেশ্য—ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন। এ ব্যাপারে আনন্দিত নিবেদিতা প্রিয় বান্ধবীকে লেখেন—"জাতীয় শিল্পের পুনর্জন্ম আমার প্রিয়তম স্বপ্ন।" তাঁর ধারণা—"I sometimes think that our greatest work in modernis-

ing India might be done through Art, instead of through the Press or the Universities. And I have opportunities. But it is Art as the Minister of the Civic Spirit—of the National Sense—of History."

কোন ব্যাপারেই নিবেদিতা পিছিয়ে পড়বার মেয়ে নন। ভারতকে তুলতেই হবে বিশ্বের জনসমক্ষে। ভারতকে আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতেই হবে নিজের হৃত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, কোন কাঙালিপনা করে নয়, সবক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা-প্রদর্শন করেই। নিবেদিতা এসে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পাশে। অসহায় জগদীশচন্দ্র। বিদেশী সরকার তাঁর প্রতিভাকে অবদমিত করতে চায় নানারকম কলাকৌশলের দ্বারা। নিবেদিতা ফুঁসে উঠলেন। বিদেশী শাসকের মুখোশ খুলে দিয়ে দেশের গুণীজন ও তাঁর প্রিয়জনদের চিঠিপত্র লিখে জনমত গঠন করতে লাগলেন জগদীশচন্দ্রের হয়ে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য। রাজনৈতিক বন্ধু মিঃ গোখ্‌লেকে লিখলেন—

"Dr. Bose's deputation—as you already know—was refused. But how thankful I am that he has succeded in obtaining furlough! What with the intolerable combination that was formed in the Education Department, and the threatened break-down in his health, I do not know what the consequences would have been, if he had been forced to fill out the term, working 20 hours a week, and harassed by unending official correspondence!"

জগদীশচন্দ্র বিষয়ে নিবেদিতা তখন খুবই উত্তেজিত ও আবেগময়ী। প্রিয় বান্ধবীকে লিখছেন—

"ডঃ বসু সম্বন্ধে নতুন পরিকল্পনার কথা যে-চিঠিতে লিখেছ, তা আমার কাছে এসে পৌছয়নি কেবল তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে এমন দু'টি চিঠি পেয়েছি। তোমার 'আইডিয়া' কি তা অনুমান করতে পারছি না, কিন্তু যদি কোনভাবে তাঁর কোন সাহায্য করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়—সেক্ষেত্রে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতাই হবে আমার একমাত্র অনুভূতি (my only feeling would be one of the utmost thankfulness)."

জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগারের নাম পর্যন্ত শুনলে সরকার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তারা তাঁকে গবেষণাই করতে দিতে নারাজ—তা আবার গবেষণাগার। এতে নিবেদিতা কি ধরনের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, বান্ধবীকে লেখা চিঠিতে (এপ্রিল ৩, ১৯০৯) তারই প্রকাশ—

"About Dr. Bose's Laboratory—one must not talk of it. One dare not call it, even, by such a name! There is nothing that would so quickly bring down the wrath of the Government, as any whisper of such an undertaking."

ভারতমাতা ও তাঁর সন্তানগণের দুঃখ-বিমোচনে যে নিবেদিতা সময়-সময় এমনই ক্ষিপ্তা ও দৃপ্তভাষিণী, সেই নিবেদিতাই আবার আর এক মায়ের কাছে যেন ছোট্ট খুকীটি, শান্ত, অচঞ্চলা, স্নিগ্ধা—'নিবেদিতা' নাম সার্থক করতেই যেন মাতৃচরণে নিবেদিত একটি অনাঘ্রাতকুসুম। নিবেদিতার সেই মা ছিলেন শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী। মৃন্ময়ী মাকে (মা কালী) চিন্ময়ী মূর্তিতে দেখতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা। সে সাধ তাঁর মিটেছিল শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে এসে। তাঁর সেই 'সাধের মা' (নিবেদিতার ভাষায়) অথবা সাধনার মা আর একজনের অভাবও তাঁর পূরণ করেছিলেন—যিনি ছিলেন সাত-সমুদ্র-তের-নদী পাড়ে ছেড়ে-আসা তাঁরই গর্ভধারিণী মা—তাঁর আদরের 'ছোট্ট মা' (এও নিবেদিতারই কথা)।

কী পেয়েছিলেন নিবেদিতা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে? নিবেদিতা আবেগে বহুবারই নিষেধ করেছিলেন সেসব কথা বলতে তাঁর প্রিয় বান্ধবীদের, বিশেষ করে মিস্ ম্যাকলাউডকে—যাঁর কাছে তিনি মনের দুয়ার খুলে দিতেন ঝর্ণাধারার মতো। কত চিঠিই না তিনি লিখেছিলেন মিস্ ম্যাকলাউড, মিসেস্ ওলি বুল, মিসেস্ নেল হ্যামণ্ড প্রভৃতিকে। এঁরা ছিলেন নিবেদিতার কাছের মানুষ—বিবেকানন্দ-আদর্শে অনুপ্রাণিত তারা—তাই তাঁদের সঙ্গে চলত নিবেদিতার ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া পত্রালাপ অনর্গলভাবে। এঁদেরই কাছে লেখা নিবেদিতার সেইসব চিঠিতে দেখি, শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আবেগজনিত কিছু বলে ফেলেই নিবেদিতা যেন মুখে আঙুল ঠেকিয়ে তাঁদের বলতে চাইতেন—চুপ! এ-বিষয়ে নীরব থেকো। কেউ যেন না জানতে পারে এসব কথা। কারণ সে যে নিবেদিতার বড়ই বিশ্বাসের বস্তু—তারই আত্মার আলোতে উদ্ভাসিত। সেই আলোতেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ মূর্তিখানি দেখতে পেতেন সর্বদা, এমন কি সুদূর আমেরিকাতে বসেও। তাঁর প্রাণের ভাষায় লিখিত সেইরকমই একটি চিঠি—অনবদ্য ক্লাসিক! আবার চিঠিটি লেখা স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকেই। তারই সংক্ষিপ্ত অনূদিত রূপ -

"প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়। আমরা তোমার কাছে খুব

শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি। সত্যিই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।…”

শ্রীমা সম্বন্ধে নিবেদিতার আর একখানি অনুভূতিপূর্ণ ক্লাসিক পত্র—লিখেছেন বান্ধবী মিসেস হ্যামণ্ডকে—আর তাতে নিবেদিতার পূজারিণী মূর্তিটিই ফুটে উঠেছে—

“অসীম মাধুর্যে ভরপুর ইনি (শ্রীশ্রীমা)। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর! অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশী।… আর কী যে মিষ্টি তিনি! আমাকে বলেন. ‘আমার খুকী’।…অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য।… চারিদিকে ঘণ্টা বাজছে, সুর ভেসে আসছে, এখন যে সন্ধ্যারতির কাল। ছাতের ওপরে উঠে যাব এখন, চুপ করে শুয়ে দেখব তারকাদের ফুটে ওঠা আকাশ-অঙ্গনে।…একে আমি বলি শান্তি-লগ্ন। সন্ধ্যাদীপ জ্বলতে শুরু হয়েছে…অন্তঃপুরের মহিলারা প্রণত হয়েছে বিগ্রহের সামনে, এই সময়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব থেকেই সারদাদেবীর গৃহে, মহিলাদের অনেকে নিঃশব্দে জপমালা ঘুরিয়ে চলেছে। ·”

পূজারিণী নিবেদিতার আর এক সাধ ও সাধনা ছিল তীর্থদর্শন বা তীর্থ-পরিক্রমা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও তিনি হিমালয়-পরিভ্রমণ করেছেন—দর্শন করেছেন তাঁর আরাধ্যদেবকে অমরনাথের তুষারলিঙ্গে। আর ১৯১০ সালে মে-জুন মাসে শেষবার গিয়েছিলেন কেদারবদরী—সেবার তাঁর সঙ্গী সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র। রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই এই যাত্রার প্রতিটি সংবাদ পাঠাতে থাকেন প্রিয়জনদের। ১২ জুন মিসেস উইলসনকে লেখেন—“হরিদ্বার নামক মনোরম এক ক্ষুদ্র শহর থেকে আমরা যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম এবং তীর্থযাত্রার পথ অনুসরণ করে পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করতে হয়—যাত্রার সে অংশ সমাপ্ত হয়েছে—এটাই কঠিনতম যাত্রা। এখন আবার বদরীনারায়ণের তুষারের অভিমুখে…”

ঐ তারিখেই মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখেন—

“We are on the way to Badrinath. The scenery is wonderfnl, but the inconveniences of pilgrimage are many—and Mrs. Bose has fallen ill. Still, we go on and on, the great memory of Amarnath ever in my mind.—”

অসুস্থ বসু-জায়াকে সঙ্গে করেই নিবেদিতা তাঁর তীর্থযাত্রা শেষ করলেন ২৯ জুন। চড়াই-শেষে এবার উৎরাই। সম্পূর্ণ মানসিক পরিতৃপ্তি নিয়েই এবার লিখছেন নিবেদিতা উক্ত বান্ধবীকে—“Our wonderful pilgrimage

is over!—আমাদের অপূর্ব তীর্থযাত্রা সমাপ্ত। স্বামীজী নিশ্চয় চাইতেন, আমরা এই তীর্থ করি। আগামীকাল ভাগ্যে কি আছে কে জানে, কিন্তু এ এক অমর সম্পদ—এমনভাবে রক্ষিত ও পুণ্যাশিসপূত যে এমন কি খোকা [নিবেদিতার স্নেহধন্য জগদীশচন্দ্র] পর্যন্ত তার মহিমা মেনে নিয়েছে। ভালভাবে নামছি আমরা—কী স্বস্তি! (We go down well, what a relief!)"

ভগিনী নিবেদিতার তীর্থ-পরিক্রমা শেষ। এবার পত্র-পরিক্রমাও শেষ হয়ে এল। এ পৃথিবীর প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নেবার ঘণ্টা তিনি ঠিক সময়েই শুনতে পাচ্ছিলেন। এরপর আর মাত্র এক বছর জীবিত ছিলেন। বয়স হয়ে'ছল মাত্র ৪৪ এবং কয়েক বছর আগেই তিনি নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করেছিলেন এক বান্ধবীকে লেখা পত্রেই—"সম্ভবতঃ আমি ৪২ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে মরব।—I fancy I shall die in 1912." তিনি দেহত্যাগ করলেন ১৯১১-তে (১৩ অক্টোবর)। মৃত্যুকে তাঁর আহ্বান করতে ভয় ছিল না, কিন্তু আফসোস ছিল স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপন করে যেতে পারলেন না ভেবে। মৃত্যুর মাত্র ৩ মাস আগে বান্ধবীকে লেখেন—"I would be glad to die. Life has in many ways been such a failure, and I cannot feel that I am really essential to the Women's Education—and yet, as long as I live, and we are not rich enongh to separte, I have to be counted. Everything would it seems to me go better, if I could be left out!"

এ কী তাঁর আফসোস, না গুরুর কাছে জবাবদিহি করবার জন্য এমনি এক দীনতার ছদ্মবেশে পুনর্মিলনের আকুতি? নিবেদিতার জীবনের সাফল্য-অসাফল্যের খতিয়ান সব যে তাঁরই কাছে! মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয় বান্ধবী আমেরিকায় মিসেস্ রোয়েথলিস বারজারকে (নিবেদিতা তাঁকে 'সেণ্ট ডোরা' বলে ডাকতেন) সেই বার্তাই পাঠালেন এক বিষাদ-মধুর চিঠিতে (২৩শে এপ্রিল, ১৯০৩):

"প্রিয় সেণ্ট ডোরা, যদি তুমি সত্যিই এত শীঘ্র ছেড়ে চলে যাও এবং যদি তুমি তার পরে তাঁর সাক্ষাৎ পাও (পাবেই জানি), যাঁর উদ্দেশে আমার সকল প্রার্থনা নিবেদিত, তাঁকে বলো, তিনি যেন আমার হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখেন, সেখানে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততার কোন হানি ঘটেছে কিনা—যে বিশ্বাস তিনি পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেছিলেন। তাঁকে অন্ততঃ একথা বলো—একমাত্র তিনিই ভাঙেন বা ভাঙতে পারেন। এই আশিস্‌ই তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। তাঁকে আরও শুধিয়ো, অবতারই তো শুধু পৃথিবীকে বলতে পারেন—আমাকে যেভাবে পার ভালবাসো, আমাকে ভালবাসাই মুক্তি।" (এই কথা স্বামীজীও একবার বলেছিলেন নিবেদিতাকে)।

না, জীবনে লাভ লোকসান এবং সাফল্য-অসাফল্য নিয়ে নিবেদিতার কোন কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর কর্মাকর্ম ধর্মাধর্ম সবকিছুই তিনি তাঁর গুরুর কাছে সঁপে নিশ্চিন্ত ছিলেন আজীবন। তাঁর পরম আকৃতি ছিল শুধুমাত্র একটি বিষয় নিয়েই, তাহলো তাঁর পরম প্রাপ্তি বিষয়ে—বিবেকানন্দ-সাযুজ্য! মরণের পরে সেই আনন্দলোকের (বা বিবেকানন্দ-লোকের) অনির্বচনীয় আনন্দের কথা কল্পনা করে প্রিয়তমা বান্ধবী মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখে জানালেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ তারিখে লেখা চিঠিতে তাঁর হৃদয়ের সেই গভীরতম আকৃতি ও মধুরতম প্রার্থনা : "প্রিয়তমা যুম (বান্ধবীকে স্নেহ সম্ভাষণ), আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি হয়তো ভারতে আর আসবে না, আমি হয়তো যাব না পাশ্চাত্ত্যে। যদি তাই হয়—আমরা আর কখনো মিলব না! [প্রকৃত ঘটনাও সেই রকম। নিবেদিতা যখন ভারতের দার্জিলিঙ শহরে মহাপ্রয়াণ করেন মিস্ ম্যাকলাউড তখন আমেরিকায়] অদ্ভুত! অদ্ভুত! পৃথিবী রইল, জীবনও রইল, তবু তোমার সাক্ষাতে এলাম না—বিচিত্র বটে! তবু তা ঘটতেই পারে। তবু মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপারের জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কতই সহজ হয়ে আসে! মৃত্যুর একেবারে পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী কিভাবে তাঁর 'বুড়ো লোকটির' [শ্রীরামকৃষ্ণ] সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার ভাবে থাকতেন, আমি তা দেখেছি, তা যদি সত্য হয়—সত্য না হবে কেন—অন্যদের ক্ষেত্রেও পুনর্মিলন বা হিসাব-নিকাশ থাকবে না কেন ?···

"আমি নিশ্চিত অনুভব করি,—তিনি (স্বামীজী) যা ছিলেন আরও বেশি করে তাই হয়ে উঠবেন। কতখানি, তা সহজে কল্পনা করা শক্ত। তাঁর মধ্যে ছোট খাট জিনিসগুলি তাঁর চরিত্রের গভীরতম, বিশিষ্টতম লক্ষণ···"

এই চিঠির শেষাংশ বাস্তবিকই অনন্য—'ক্লাসিক'। নিবেদিতা যেন সত্য সত্যই সেই পুণ্যলোকে 'আলোকের ঝর্ণা ধারায়' অবগাহন করে উঠে এসে মর্ত্যবাসীর কাছে রাখলেন একটি সুন্দর অমৃতবার্তা :

"কিন্তু যুম, ও যুম! মনে হয় আরও কোথাও না কোথাও আসফোডেল এবং ক্রোকাসের প্রান্তর থাকবে, তার মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয়ে যাবে—সেখানে তুমি এবং আমি তাঁর জ্যোতির্মণ্ডলে বাস করব, আর তাঁরই সঙ্গে ঘুরব ফিরব !···"

(But Oh Yum Dear ! I do feel as if somewhere there must be meadows of asphodel and crocus, with still waters passing through, where you and I shall live in His radiance and wander up and down !)

অনন্যা নিবেদিতার অনন্য চিঠিপত্রগুলি আমাদের কাছে সেই অনির্বচনীয় জ্যোতির্লোকের দ্বারও উন্মোচন করেছে এবং ভাষায় ও ভাবের মাধুর্যে তা নিঃসন্দেহে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ ক্লাসিকস্তরে উন্নীত হয়েছে।

———